আকাশ আলোক তনুমন প্রাণ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

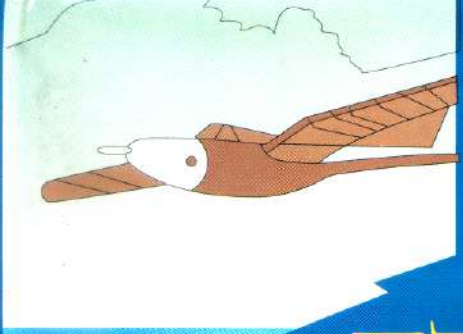

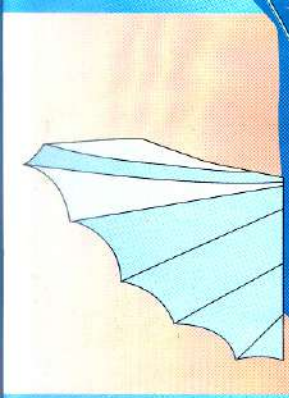

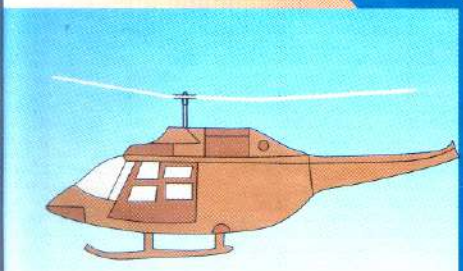

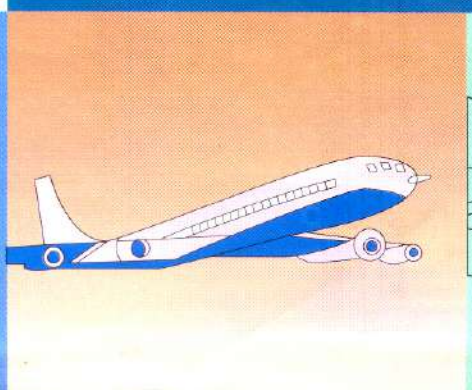

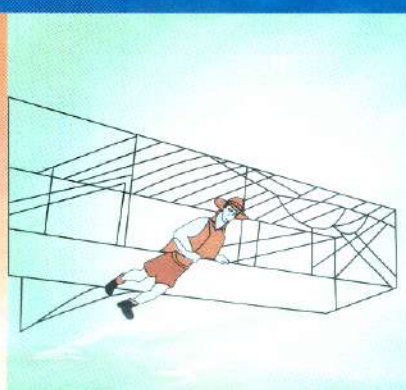

আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ

আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

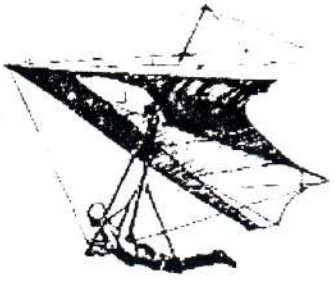

সূ চি প ত্র

হাওয়ার তালে দুলকি চালে ৭
চলো যাই বিমানবন্দর ১২
চলো বিমান ওড়াই ১৬
যেদিন তুমি মহাকাশে যাবে ২৩
উল্কাপাত ২৫
সাবানের বুদবুদ ২৭
সাধারণ ঘটনার পদার্থবিদ্যা ৩১
বাঁ-হাতি ৪১
দুই বন্ধুর উপাখ্যান ৪৪
সন্দেহ, আবিষ্কার এবং একটি বই ৪৮
থার্মোমিটার ৫০
রক্তচাপ মাপার যন্ত্র ৫৩
মশার কামড় ৫৫
হার্ট আমার হার্ট ৫৭

হাওয়ার তালে দুলকি চালে

বিমান চালাবে, এ তো তোমাদের অনেকেরই স্বপ্ন। তোমার বিমানে থাকবে শক্তিশালী ইঞ্জিন—বাতাসের ঝাপটা, পৃথিবীর টান সবকিছু অগ্রাহ্য করে ছুটবে সেটি। কিন্তু যদি তোমার বিমানে সেরকম কোনো ইঞ্জিন না থাকে, যদি তোমাকে উড়তে হয় ঐ বাতাসেরই ঝাপটার সহায়তায়, কিংবা পৃথিবীর টানটুকুকেই কাজে লাগিয়ে, তখন কিন্তু ওড়ার মজাটা বেড়ে যেতে পারে অনেকখানি। এ যে রীতিমতো বাতাসের ঢেউয়ে দোল খেয়ে চলা। অবশ্য তোমার মর্জিমাফিক সবকিছু হবে না, তোমাকে উড়তে হবে বাতাসের সঙ্গে আপোস করে। তাই আশেপাশে কী ঘটছে লক্ষ রাখতে হবে বেশি, মাটিতে কোথায় কী রয়েছে, হাওয়ায় পাখিরা কেমনভাবে উড়ছে, মেঘের আকৃতি কী কীরকম সবকিছু খেয়াল করে বুঝে-সুঝে ধীরে-সুস্থে এগোতে হবে তোমাকে। আর সেটিই তো তুমি চাও। কাজেই দেরি না করে চলো গ্লাইডার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

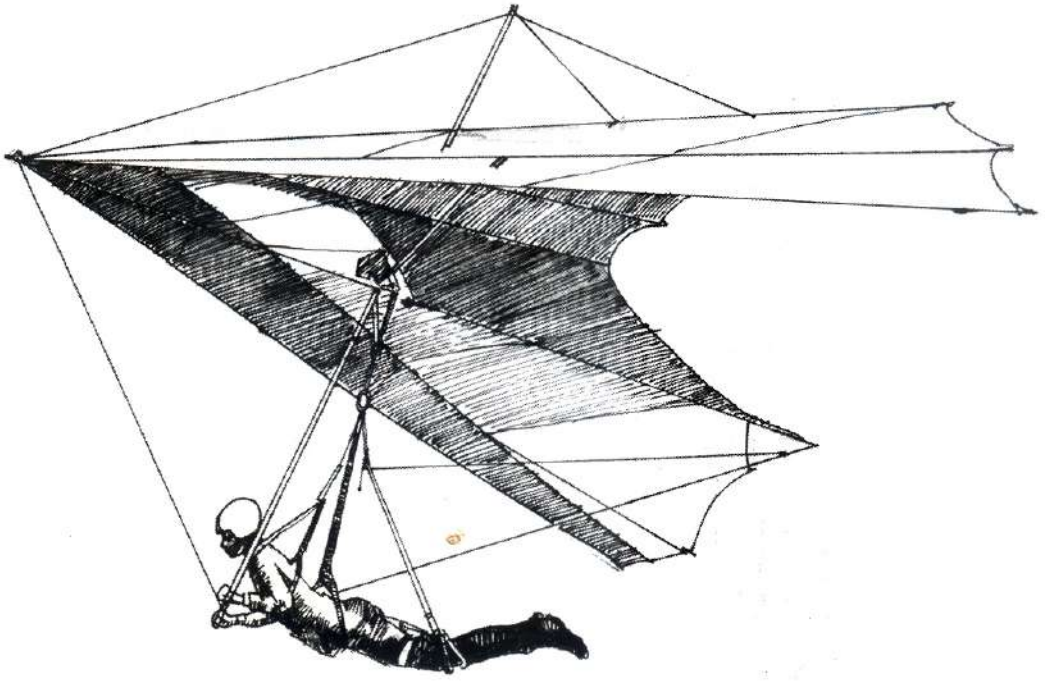

হ্যান্দা গ্লাইডার

হ্যাঁ, গ্লাইডার—ইঞ্জিনবিহীন বিমানের ঐ-ই নাম। বিমানবন্দরে রানওয়ের উপর ওড়ার জন্য অপেক্ষা করছে ঐ যে সরু, ছিমছাম, হালকা বিমানটি ওটিই তোমার গ্লাইডার। ডানাগুলো কী ভীষণ লম্বা আর সরু! গ্লাইডারে এমনটি হয় কারণ তাতে চলার পথে বাতাসের বাধা কমাতে সুবিধা হয়। এই যে তোমার গ্লাইডারটা, এর ডানা লম্বায় ১২ মিটার অথচ এর দেহ মাত্র ১ মিটার চওড়া। আসলে বিমানই বলো আর গ্লাইডারই বলো উড়তে গেলে ডানার প্রান্তের পেছনে বাতাসের একটি ঘূর্ণির মতো সৃষ্টি হয় যা একে পিছে টেনে রাখতে চায়, এগুতে বাধা দেয়। ডানা সরু লম্বা হলে এটি কম হয়। বিমানের তো ইঞ্জিন আছে, সেখানে অত ভাবনা নেই। কিন্তু গ্লাইডারের এটি ভাবতে হয়। এখানেও ডানার কাজটি বিমানের মতোই, বাতাসে ভেসে উপরে থাকতে সাহায্য করা।

ডানার আকৃতিটি এমনভাবে তৈরি হয় যে এর উপরের দিকে একটি বলের সৃষ্টি হয় যা বিমানকে ভাসিয়ে রাখে। ইঞ্জিনের শক্তিতে বিমান দ্রুত এগিয়ে গেলে তার ডানার উপর-নিচ দিয়ে এমনি বাতাসের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু গ্লাইডারের কী হবে? সেটি নাহয় চলতে চলতেই বোঝা যাবে। আপাতত চলো গ্লাইডারে চড়ে বসি।

ছাদটা বড় বেশি কাছাকাছি মনে হচ্ছে ? যে-কোনো সময় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারে। তবুও তো ভালো, কোনো কোনো গ্লাইডারে তো তোমার খাড়া হয়ে বসার মতো জায়গাও থাকে না, চিত হয়ে হেলান দিয়ে চালাতে হয়। এর কারণ গ্লাইডারকে সরু ও মসৃণ করে তৈরি করতে হয়—আগাগোড়া। বসার জায়গাটায় ছাদ যদি উপরের দিকে ফুলে থাকে তা হলে ওখানে বাতাসের বাধা বেড়ে যায়। বাধা যত কমানো যায় তত লাভ।

মাটির উপর যতক্ষণ আছ নিজের থেকে গ্লাইডারের সামনে এগোবার কোনো উপায় নেই। তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। তাই লক্ষ করো তোমার সামনে যে একটি ছোট ইঞ্জিনওয়ালা বিমান রয়েছে যার সঙ্গে দড়ি দিয়ে তোমার গ্লাইডারটি বাঁধা রয়েছে। তুমি প্রস্তুত হলেই ঐ বিমান দৌড়ে গিয়ে আকাশে উঠে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার গ্লাইডারকেও তুলে ফেলবে। ৬০০ থেকে ৯০০ মিটারের মতো উপরে ওঠার পর এবার তুমি স্বাধীনভাবে ওড়ার কথা চিন্তা করতে পারো, ঐ বিমানের সাহায্য ছাড়াই। সামনের ঐ হাতলটি ঘুরিয়ে দাও— বিমানে বাঁধা দড়ি থেকে আলগা হয়ে গেল তোমার গ্লাইডার। এইবার বাতাসের সঙ্গে তোমার একার বোঝাপড়ার পালা— ইঞ্জিন নেই, তবে কৌশল তো আছে।

তুমি গ্লাইডার নিয়ে যেভাবে আকাশে উঠলে তা না করে অন্যভাবেও ওঠা যেত। একটি দ্রুতগামী গাড়ি তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে পারত যেমন করে ঘুড়ি-হাতে দৌড়ে গিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেওয়া হয়। অথবা গ্লাইডারের সঙ্গে বাঁধা দড়ি দ্রুতগতিতে টেনে গুটিয়ে নিয়েও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যেত। যাক সেকথা, উঠে তো পড়েছই, এখন ভেসে থাকার কথা ভাবা যাক। ঐ বিমানটি যে টান দিয়ে গিয়েছিল তার প্রভাব এখন কমে আসছে, গ্লাইডারের গতি কমে আসছে। ডানার উপর-নিচ দিয়ে বাতাসের স্রোত যথেষ্ট না থাকলে একে তুমি বাতাসে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না, এটি নিচে নেমে আসবে। তাই অবিলম্বে গ্লাইডারের গতি বাড়ানো দরকার। একে সমতলে রেখে সেটি সম্ভব নয়। কাজেই গ্লাইডারের নাকটি সামান্য একটু নিচু করে দাও, যেন এটি ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে এমন

ভঙ্গিতে। পৃথিবীর টানেই এটি তখন এগিয়ে যাবে সামনের দিকে এবং একটু নিচের দিকেও বটে। এভাবে গ্লাইডারের গতিবেগ বাড়বে, একে ভাসিয়ে রাখার মতো ঊর্ধ্বমুখী বল সৃষ্টি হবে এর ডানার নিচে। নাক যত নিচু করবে গতি ততই বাড়বে। গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের এটিই তোমার উপায়।

গ্লাইডারের নাকটা নিচু করার জন্য তোমাকে কী করতে হবে? পেছনে লেজের উপর যে ছোট্ট দুটি খুদে ডানা রয়েছে তাতে কাটা আছে দুটি কপাট। তোমার সামনের নিয়ন্ত্রণ-কাঠিটি নেড়ে তুমি কপাট দুটি উপরে তুলতে, নিচে নামাতে বা সমতলে রাখতে পারো। একটুখানি নিচে নামালেই সেগুলোতে বাতাস লেগে গ্লাইডারকে লেজ উঁচু নাক নিচু অবস্থায় নিয়ে যাবে। নিচের দিকে মুখ করে তোমার গ্লাইডার এগুবে বটে কিন্তু সোজা তুমি একে নিয়ে নিচের দিকে যাবে এমন কোনো কথা নেই। ঐ অবস্থাতেই তুমি এদিক-ওদিক ফিরবে, ঘুরপাক খাবে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানের দিকে যাবে।

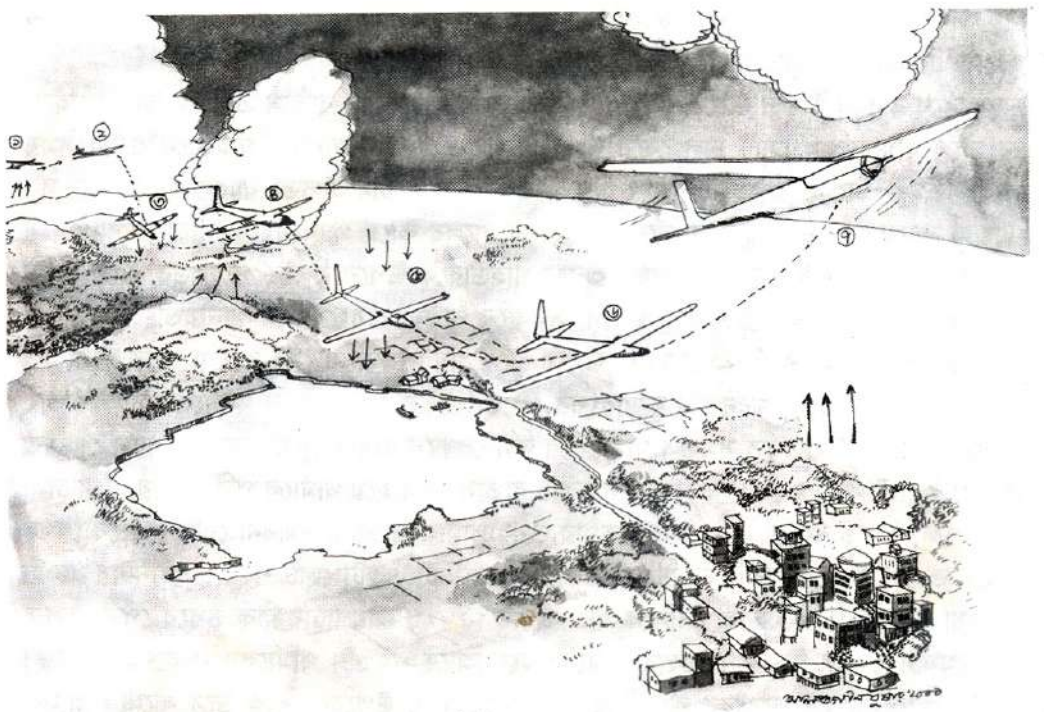

উড়ন্ত গ্লাইডারের বিভিন্ন অবস্থান

লেজের সঙ্গে রয়েছে যে হাল সেটি অনেকটা নৌকার হালের মতোই কাজ করে। একে ডানে-বামে ঘুরিয়ে তুমি গ্লাইডারকে ঘোরাতে পারো। তোমার পায়ের কাছে রয়েছে যে দুটি প্যাডেল তাতে চাপ দিয়েই তুমি হালটি ঘোরাতে পারো। কিন্তু ঘোরার সময় যেদিকে ঘুরছ সেদিকে গ্লাইডারকে একটু কাত করাও প্রয়োজন। এটি করা হয় ডানার প্রান্তের দিকে থাকা দুটি কপাট উঁচুনিচু করে। নিয়ন্ত্রণ-কাঠি ডানেবামে নেড়ে তুমি একদিকের কপাট উঁচু ও অন্যদিকের কপাট নিচু করতে পারো। তাতে গ্লাইডার কাত হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘোরাঘুরি যা-ই করো-না কেন, তুমি কিন্তু ক্রমাগত নেমে যাচ্ছ, সেকথা ভুলে যেও না যেন। এভাবে নামতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি ভূমিতে পৌঁছে যাবে। কাজেই বেশিক্ষণ আকাশে থাকতে চাইলে কোনো-না-কোনো উপায়ে গ্লাইডারের উচ্চতা বাড়িয়ে নিতে হবে। যদিও নাক তোমার বরাবরই নিচের দিকে থাকছে তবুও মাঝে মাঝে উচ্চতা বাড়িয়ে নেবার সুযোগ তোমার আছে। সে-সুযোগ এনে দেয় ঊর্ধ্বগামী বায়ু।

ওড়ার পথে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এমন কিছু বাতাসের যা উপরে উঠে যাচ্ছে। গ্লাইডারকে এর উপর চড়াও করতে পারলে তুমি উচ্চতা বাড়িয়ে নিতে পারো। যে-হারে গ্লাইডার নামছে বাতাস যদি তার চেয়ে অধিক হারে উঠতে থাকে তা হলেই উচ্চতা বাড়বে। কাজেই তোমাকে সবসময় লক্ষ রাখতে হবে কোথায় এরকম ঊর্ধ্বগামী বাতাস পাওয়া যায়, আর পেলে তার সুযোগ নিতে হবে।

নানা কারণে বাতাস উপরে উঠতে পারে। উঁচু পাহাড়ের দিকে যদি বাতাস প্রবাহিত হয়, তা হলে পাহাড়ের ঢালে বাধা পেয়ে সেটি ঢাল বেয়ে উপরে উঠবে। এরকম জায়গায় গ্লাইডারে ওড়ার সময় পাহাড়ের স্রোতমুখী ঢালের কাছে এপাশ ওপাশ কিছুক্ষণ উড়ে তুমি উচ্চতা বাড়িয়ে নিতে পারো। অবশ্য এজন্য বাতাসের স্রোত থাকতে হবে। পাহাড়ের ঢালের কাছে পাখিদেরকে ডানা না ঝাপটিয়ে উড়তে দেখলে বুঝবে এরকম স্রোত রয়েছে। অবশ্য গ্লাইডারকে উপরে তুলতে পাহাড়ের কাছে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিছু-কিছু জায়গা সবখানে পাওয়া যায় যেখানে স্থানীয়ভাবে অতিরিক্ত গরম হয়ে বাতাস সোজা একটি স্তম্ভের মতো উপরে উঠে যায়। বৈমানিকদের ভাষায় এদের বলা হয় থার্মাল। রৌদ্রতপ্ত দিনে বেলা খানিকটা বাড়ার পর থেকে বিকেল পর্যন্ত এমনি থার্মালের সাক্ষাৎ তুমি পাবে এখানে-ওখানে। সাধারণত সমতল গাঢ় রঙের তল যেখানে রয়েছে সূর্যের তাপ সেখানে শোষিত হয় বেশি। আর সেই গরম তলের সান্নিধ্যে ওখানকার বাতাস গরম হয়ে থার্মালে পরিণত হয়। পিচঢালা পথ, বাড়ির ছাদ, উন্মুক্ত কর্ষিত মাঠ এমন জায়গার উপর থার্মাল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঐ যে দেখছ গাছপালাহীন জায়গাটায় বেশ কিছু ঘরবাড়ি ঘন হয়ে আছে, ওটা একটা ছোট শহর, সেখানটায় একটি থার্মাল পাওয়া যেতে পারে— চলো সেদিকে যাওয়া যাক। দেখছ জায়গাটার ঠিক উপরে পেঁজা তুলার মতো স্তূপ মেঘটা কেমন উঁচু আর গুম্বজের মতো হয়ে আছে— ওটা থার্মালের কারণেই হয়েছে। পাখিগুলোও ওখানে কেমন ডানা না ঝাপটিয়ে গা এলিয়ে দিয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আমরা জায়গাটার কাছে চলে এসেছি। দেখো ধুলা, শুকনো পাতা ইত্যাদি উপরে উঠছে। কোনো সন্দেহ নেই এখানে থার্মাল রয়েছে। এখানে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে কিছুক্ষণ থেকে আমরা আবার বেশ উপরে উঠে যাব।

এবার আবার আমরা চলতে পারি যেদিকে ইচ্ছে। চলতে চলতে নেমে যাব বটে, কিন্তু তাতে কী? দরকার হলে আবার থার্মাল খুঁজে নেয়া যাবে। ঐ যে সামনের বিরাট বিলটা সেখানে অবশ্য পানি

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাই হবে আশেপাশের মাটির চেয়ে। কাজেই ওখানটায় না যাওয়াই ভালো, কারণ বাতাসের স্রোত নিচের দিকে বলে ওখানে আমাদের উচ্চতা অতিরিক্ত কমে যেতে পারে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঐ যে বনটি দেখা যাচ্ছে তাও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হবে। এর উপরে না গিয়ে বরং একটু ঘুরে গেলেই আমরা নামব কম। ঠিক এখনই তো নেমে যেতে চাচ্ছি না।

গ্লাইডারের চালকের আসনে তোমার সামনে যে কয়েকটি মিটার রয়েছে এগুলো নিশ্চয়ই তোমাকে খুব সাহায্য করছে ওড়ার সময় ? এর মধ্যে একটি হল কম্পাস, এটি বলে দিচ্ছে তুমি কোন দিকে চলেছ। আর একটি হল বাতাসের গতিবেগ মাপার মিটার। বাতাসের মধ্য দিয়ে গ্লাইডারের গতিও এতে বোঝা যাচ্ছে। আর মাটি থেকে তোমার উচ্চতা কতখানি সেটি জানার জন্য রয়েছে আলটিমিটার। উচ্চতা বাড়লে-কমলে তুমি এর থেকেই সেটি বুঝতে পারছ। তবুও আরো একটি মিটার রয়েছে তোমাকে সাহায্য করার জন্য—সেটি ভেরিওমিটার। গ্লাইডারের উচ্চতা সবসময় পরিবর্তিত হচ্ছে ; হয় নামছে, নইলে উঠছে। ওঠা-নামা আরো সহজে বোঝার জন্য এই মিটার সরাসরি বলে দিচ্ছে তুমি কী হারে নামছ অথবা উঠছ।

নাঃ, অনেকক্ষণ হল, এবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে হয়। যে-উচ্চতায় আছি তাতে অনায়াসে ফিরে যেতে পারি এয়ারপোর্টে, যেখান থেকে উঠেছিলাম। ঐ যে রানওয়ে, এবার নাক আরো নিচু করে দ্রুত আর বরাবর নেমে পড়ো। মাটির একেবারে কাছে গিয়ে নামার ঠিক আগে আবার সোজা সমান্তরাল হয়ে নিতে হবে। এ-সময় অল্প গতিবেগেও যেন ভেসে থাকা যায় সেজন্য পাখার উপর থাকা আরো দুটো কপাট নিচের দিকে নামিয়ে খাড়া করে দিতে হবে। এতে বাতাস ধরে ভেসে থাকতে সুবিধা হয়।

বিমানবন্দরে ফিরে আসার মতো উচ্চতা যদি তোমার গ্লাইডারের না থাকত তা হলে কী করতে? ফেরার সময় যতগুলো থার্মাল আশা করেছিলে তা হয়তো তুমি পেলে না। তা হলে কী হবে? ভয়ের কিছু নেই, একটা সমতল খোলামেলা জায়গা খুঁজে বের করো, সেখানেই নেমে পড়ো। গ্লাইডারের গতিবেগ বেশি নয়। ওড়ার সময়েই এর গতি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটারের খুব একটা বেশি হয় না, নামার সময় তো আরো কম। কাজেই মোটামুটি একটা জায়গা পেলেই হল। আর তোমার গ্লাইডারটা ইচ্ছে করলে জোড়ায় জোড়ায় খুলে ফেলে তুমি ওখান থেকে নিয়েও আসতে পারবে।

চলো যাই বিমানবন্দর

কোন বিমানবন্দরে যাব আমরা? যে-কোনোটিতে অথবা সবকটিতে। বিমানে চড়ে কোথাও যাবার তাড়া তো আমাদের নেই, আমরা শুধু বিমানবন্দরেই যেতে চাই সেখানে কী হচ্ছে দেখতে। তাই এটি হতে পারে ছোট একটি বিমানবন্দর আমাদের সৈয়দপুর কিংবা রাজশাহী বিমানবন্দরের মতো, অথবা জিয়া আন্তর্জাতিকের মতো বড় একটিতে। ওখানেই-বা থামি কেন? কেন নয় নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি, কিংবা প্যারিসের চার্লস দ্য গল কিংবা রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো আরো বিশাল কিছু? আবার অস্ট্রেলিয়ার ধুধু মাঝখানে যেখানে স্থানীয় খামারের ব্যবহারের জন্য ঐ গ্রাম্য বিমানবন্দর রয়েছে একটুখানিক, তাতেও-বা নয় কেন?

বিমানবন্দর

বিমানবন্দরের কাজ বিমান ওঠার আর নামার ব্যবস্থা করে দেওয়া। তা ছাড়া এমন জায়গা দেওয়া যেখানে দাঁড় করিয়ে বিমানের দেখাশুনা করা যায়, তেল ভরা যায়, আরোহীর ওঠানামা স্বচ্ছন্দ হয়। প্রয়োজনে বিমানকে নিরাপদে কিছু সময় রেখে মেরামতের ব্যবস্থাও থাকতে পারে এখানে। যারা বিমানে ভ্রমণ করবে তাদের কাছে বিমানবন্দর একটি স্টেশনের মতো—টিকেট কাটার, টিকেট দেখাবার, মালপত্র তোলার এবং আরোহণের কিংবা পৌঁছে মালপত্র সংগ্রহ করে চলে যাবার।

এসব কাজ করতে বিমানবন্দরে কী কী আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যত ছোটই হোক আর যত বিশালই হোক, ঐ টার্মিনাল ভবনেই আমাকে যেতে হবে, যাত্রী হিসাবে এলে। এখানেই নানা বিমান কোম্পানির অফিস, টিকেট দেখার কাউন্টার, ব্যাংক, তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে। ওখানে আবার টেলিভিশনের মতো যন্ত্রলিপি ভেসে ওঠে। ক্ষণে-ক্ষণে খবর পাওয়া যাচ্ছে কোন বিমান কোথা থেকে কখন আসছে, কখন যাবে। মাইকে ঘোষণাও দেওয়া হয় এসব বিষয়ে।

টিকেট দেখিয়ে, মাল জমা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে আরো কতগুলো ব্যবস্থা যাত্রীকে পার হতে হয়। ভ্রমণটি যদি আন্তর্জাতিক হয় তা হলে পাসপোর্ট ভিসা দেখাবার ব্যাপার আছে। তারপর রয়েছে নিরাপত্তা অনুসন্ধান। সত্তরের দশক থেকে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটতে থাকলে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বত্র খুব জোরদার হয়েছে। হাতের ব্যাগ ইত্যাদি খুলে দেখা, অথবা এক্সরে দিয়ে দেখা এর মধ্যে অস্ত্র জাতীয় কিছু আছে কি না। শরীরের কোথাও কিছু লুকানো আছে কি না সবই দেখতে হয়—সাবধানের মার নেই। তারপর সময় হলে সঠিক ফটক দিয়ে বের হয়ে বিমানে আরোহণ করা। পুরো টার্মিনাল ভবন যাত্রীদের এসব নানা ব্যবস্থাপনাতেই ব্যস্ত।

যাত্রীদের দেখাশোনা করা ছাড়াও বিমানবন্দরে আরো বেশকিছু কাজ চলছে। টার্মিনাল ভবনের ওধারে আছে বিশাল মাঠ যেখানে বিমান উঠছে, নামছে। ওখানকার ব্যবস্থাপনা করাও এর কাজ। আমরা তো আর যাত্রী নই, আমরা বরং সেই ব্যবস্থাগুলোই দেখি মনোযোগ দিয়ে। এসব কাজের নিয়ন্ত্রণগুলো চলছে যে-জায়গায় সেটি হল কন্ট্রোল টাওয়ার। বলা যায় এটিই বিমানবন্দরের স্নায়ুকেন্দ্র। ঐ যে টার্মিনাল ভবনের উপরে চারিদিকে কাচ দেয়া ছোট ঘরটি—সেটিই কন্ট্রোল টাওয়ার। এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাই বিমানগুলোর সমস্ত আসা-যাওয়া ঠিক করে দেন, নিয়ন্ত্রণ করেন। এজন্য তাঁদের কাছে রয়েছে নানারকম যন্ত্র : রাডার, রেডিও, আলোক সংকেত, আরো কত কী!

ছোট বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের কাজ খুব কঠিন না হলেও, এমনও সব বড় বড় বিমানবন্দর আছে যেখানে কন্ট্রোল টাওয়ারের কর্মীদেরকে শত শত বিমান ওঠা-নামার ব্যবস্থা করে দিতে হয় এক ঘণ্টার মধ্যে। টাওয়ারের চারিদিকের বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে তাঁরা দেখতে পান বিমান আসতে-যেতে। অবশ্য শুধু দেখে নয়, যন্ত্রের উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয় বেশি।

কন্ট্রোল টাওয়ারকে সবসময় যার উপর কড়া নজর রাখতে হয় তা হল রানওয়ে। বিমানবন্দরে থাকে বিমান ওঠানামার চওড়া এবং দীর্ঘ সোজা রাস্তা—এই রানওয়ে। এর উপর দৌড়ে গিয়ে বিমান আকাশে ওঠে। আবার নামার সময় এর উপর নেমেই বিমান খানিকক্ষণ ছুটে গিয়ে পরে থেমে পড়ে। যে-বন্দরে যত বড় বিমান নামতে হবে তার রানওয়ে হতে হবে সেরকম বড়। সেই যে বলেছি খামারের কাজে ছোট বিমানবন্দর যেখানে দু'একজন বসতে পারার মতো ছোট বিমান ছাড়া আর কিছু যায় না। তাই এখানে ঘাস-কেটে-রাখা একটুখানি জমিই রানওয়ের কাজ করতে পারে। আবার বড় বড় বিমানবন্দরের রানওয়ে হতে পারে শক্ত পাকা করা চার কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা রাস্তা। রানওয়ের

দুই প্রান্তে আবার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে খালি থাকতে হয়—বিমান ওঠার বা নামার পথে বাধা সৃষ্টি না হবার জন্য। কাজেই সর্বমোট ছয় কিলোমিটারের মতো বিস্তীর্ণ জায়গাই সেসব রানওয়ের জন্য দরকার হয়।

রানওয়ের অবস্থান ও সীমানা যাতে পাইলটের কাছে সহজে নজরে পড়ে সেজন্য রানওয়ের মাঝ-বরাবর এবং কিনারা দিয়ে লম্বালম্বি এবং এর দু'প্রান্তে আড়াআড়ি দাগ কাটা থাকে। দুই প্রান্তে যে দুটি সংখ্যা লেখা থাকে সেটি ঐ প্রান্তের দিকনির্দেশ করে। যদি লেখা থাকে ১৮ এবং ৩৬ তা হলে বুঝতে হবে রানওয়েটি বরাবর উত্তর-দক্ষিণ (১৮ মানে কম্পাসের ১৮০ ডিগ্রি, ৩৬ মানে ৩৬০ ডিগ্রি)। বড় বিমানবন্দরে অন্তত দুটি দিকে দুটি রানওয়ে থাকে। এর কারণ বিমান সবসময় চেষ্টা করে যথাসম্ভব বাতাসের গতির বিপরীত দিক থেকে উঠতে বা নামতে। এর ফলে ডানার উপর দিয়ে সামনে থেকে পেছনে বয়ে যাওয়া বাতাসের জোর বেশি হয় এবং বিমানের নিজের অপেক্ষাকৃত কম গতি নিয়েও এটি ভাসমান থাকতে পারে। এতে ওঠানামা সহজ হয়। বিভিন্ন দিকে রানওয়ে থাকলে এর কোনোটির কোনো এক প্রান্তের দিক থেকে এসে তখনকার বায়ুর মোটামুটি মুখোমুখি থাকা সম্ভব হয়।

রাতের বেলা রানওয়ের রেখাগুলো তো দেখা যাবে না, তাই জ্বালাতে হয় আলো। দুই কিনারা বরাবর সাদা আলোর সারি রানওয়েকে দেখিয়ে দেয়। সবুজ আলো দেখায় রানওয়ের প্রান্ত। সাদা আর লাল আলোর সমন্বয় বুঝিয়ে দেয় এর ঠিক সামনেই বিমানের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করতে হবে নইলে রানওয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে। বিমান রানওয়ে থেকে বিভিন্ন থামার জায়গায় যাওয়ার জন্য থাকে দীর্ঘ ট্যাক্সি-ওয়ে। এ-পথের উপর দিয়ে বিমান ধীরে ধীরে রানওয়ের দিকে এগোয় বা রানওয়ে থেকে আসে। রাতে ট্যাক্সিওয়েগুলো সাধারণত নীল আলো দিয়ে দেখানো হয়।

কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে যারা বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের নির্দেশেই ঠিক হয় কখন কোন বিমান কোন রানওয়ে দিয়ে কোনদিক থেকে উঠবে বা নামবে। যখন ব্যস্ত বিমানবন্দরে অনেক বিমান ওঠার বা নামার জন্য অপেক্ষা করে, তখন তাদেরকে একে একে কার পর কে যাবে সেটি ঠিক করতে হয়। এ-কাজ যেন নিরাপদে, আরামে হয় এটি যেমন দেখা দরকার তেমনি জ্যাম সৃষ্টি না করে যথাসম্ভব দ্রুত যেন এটি হতে পারে তাও দেখতে হয়। বিমান চলাচলে সময়ের মূল্য অনেক।

ধরা যাক, বেশ কয়েকটি বিমান একসঙ্গে বিমানবন্দরের কাছে হাজির হয়েছে, সবাই নামতে চায়। এক্ষেত্রে কন্ট্রোল টাওয়ার কী করবে? বিমানগুলো যাতে একে একে নামতে পারে এজন্য বিমানবন্দর থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি পাক খাবার জায়গা নির্দিষ্ট করা থাকে। উপবৃত্তাকার পথে বাতাসের এক স্তরে একটি করে বিমান এখানে পাক খেতে শুরু করে। একটির উচ্চতার সঙ্গে অন্যটির প্রায় ৩০০ মিটারের পার্থক্য থাকে। সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে এভাবে পাক খাবার পর নির্দেশমতো প্রত্যেকটি বিমান নিচের পরের স্তরে নেমে আসে একের পর এক। যেটি সর্বনিম্ন স্তরে পাক খাচ্ছিল সেটি প্রথম এগিয়ে যাবে রানওয়ের উদ্দেশে। তারপর কিছু সময় পরে অন্যটি। ইতিমধ্যে আগেরটি রানওয়ে স্পর্শ করেছে এবং সেখান থেকে চলে যাবার পথে। যে-জায়গায় এভাবে স্তরে স্তরে পাক খাওয়াবার ব্যবস্থা সেটি বিমানকে নির্দেশ করা হয় এখানে রাখা একটি খাড়া রেডিও-বিমের মাধ্যমে। ঐ জায়গার চারিদিকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার জায়গাতে কোনো বিমানকে ঢুকতে দেয়া হয় না যাতে পাক-খাওয়া বিমানগুলো নিরাপদে থাকে।

বিভিন্ন নির্দেশ দেবার জন্য কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে বিমানের পাইলটের রেডিও যোগাযোগ বিমান বেশ দূরে থাকতে স্থাপিত হয়। যখন ঘন কুয়াশায় বা খারাপ আবহাওয়ায় দূরের কিছু দেখা যায় না

তখন কন্ট্রোল টাওয়ারের কাজ আরো কঠিন হয়ে পড়ে। এ-ধরনের অবস্থা মোকাবেলার জন্য কিছু যান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে একটি হল আইএলএস বা যান্ত্রিক অবতরণ-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পাইলটকে রানওয়ে দেখে ঠিক করতে হয় না কীভাবে সেখানে নামবেন, বরং রানওয়ে থেকে পাঠানো বিভিন্ন রেডিও-সংকেতই বিমানের কাছে যাবে যেগুলো ঠিকমতো পথ দেখিয়ে বিমানকে নিরাপদে অবতরণ করাবে। বিমানের রেডিও-সংকেত-গ্রাহক যন্ত্র পাইলটকে জানিয়ে দেবে বিমান যেভাবে যাচ্ছে তাতে রানওয়ে বরাবর আছে না বামে বা ডানে থেকে যাচ্ছে। যে-পথে এটি এগোচ্ছে তা কি সঠিক নামার পথের উপরে বা নিচে রইল কি না, কিংবা যে-কোণে এটি যাচ্ছে তাতে রানওয়ের সঠিক স্থানে স্পর্শ করতে পারবে কি না। এসব যদি সঠিক না থাকে তা হলে পাইলট বিমানের গতি সেভাবে বদলে নিতে পারেন যতক্ষণ নির্ভুল পথ না পাওয়া যায়।

আজকাল অবশ্য কাজ করা সহজ করে ফেলা হয়েছে এমএলএস বা মাইক্রো ওয়েভ অবতরণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। এখানে পাইলটকে কিছুই করতে হয় না, ভূমি থেকে সংকেত গিয়ে বিমানের স্বয়ংক্রিয় চালনাব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সেটিই তাকে নিরাপদে নামিয়ে আনে। বিমানবন্দরের বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে থাকতেই এমএলএস সংকেত গিয়ে বিমানকে খুঁজে নেয়। তার পর থেকে বিমানের চালনার ভার এর হাতেই ন্যস্ত থাকে। কন্ট্রোল টাওয়ারে অন্য সব জরুরি যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে এএসআর বা বিমানবন্দর অনুসন্ধানী রেডার। এটি বিমানবন্দরের ৮০ কিলোমিটারের মধ্যে আকাশে যত বিমান চলাচল করছে তার অবস্থান, গতি সব কন্ট্রোল টাওয়ারে স্পষ্ট করে তোলে। এটি দেখে কন্ট্রোল টাওয়ারের নিয়ন্ত্রণকারীরা পাইলটকে নির্দেশ দিতে পারেন কোন উচ্চতায় কোন পথে চলাটা নিরাপদ। ব্যস্ত আকাশে বিমানগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে হলে এটি খুবই জরুরি। বিমানবন্দরের কাছ দিয়ে যে-ই চলে যাবে তাকেই কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলে যেতে হয়। বিমানবন্দরের জন্য আর যা খুব জরুরি তা হল আবহাওয়ার অবস্থা জানা। বিভিন্ন আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে নিত্য এসব খবর এখানে পৌঁছানো হয়। বিমানবন্দরেও থাকতে পারে নিজস্ব পরিমাপ-ব্যবস্থা— বায়ুর গতি, দিক, চাপ, উচ্চতা, আর্দ্রতা, সব কিছুর। তা ছাড়া বিভিন্ন উচ্চতায় আবহাওয়া, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের অবস্থা ইত্যাদি জানাও খুব জরুরি। বিশেষভাবে বিমানবন্দরের জন্য যেটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তা হল দৃশ্যমানতার দূরত্ব— কতদূর পর্যন্ত স্থান ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে তা। আর ভি আর বা রানওয়ে দৃশ্যমানতার সীমা-নির্দেশক একটি যন্ত্র রানওয়ে থেকে নিত্য পাইলটের কাছে এ-তথ্য পাঠাতে থাকে। তা ছাড়া কাছাকাছি সব বিমানের জন্য আবহাওয়ার যাবতীয় তথ্য বিমানবন্দর থেকে পাইলটের কাছে পাঠানো হয়।

বিমান নিরাপদে অবতরণ করার পর কন্ট্রোল টাওয়ারের কাজ শেষ হয়ে যায় বটে, কিন্তু অনেকের কাজ তখন সবে শুরু হয়। কেউ বিমানকে পথ দেখিয়ে সঠিক থামার জায়গায় নিয়ে যায়। কেউ এর ইঞ্জিনে অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে পুনর্বার ওড়ার জন্য নিরাপদ কি না দেখতে লেগে যায়। কেউ আসে তেল ভরার জন্য। কেউ ভেতরে ঢোকে বিমানকে সাফ-সুতরা করে আবার যাত্রার জন্য তৈরি করতে। কেউ আসে নূতন করে খাবার নিয়ে, কেউবা নূতন যাত্রীদের মাল তোলার কাজে লেগে যায়।

আমরা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে সব কর্মীর কাজ দেখলাম, সব যন্ত্রপাতির কাজ দেখলাম। বিমান আসছে যাচ্ছে, কত আরোহী উঠছেন নামছেন। তাঁরা কি খোঁজ রাখেন তাঁদের ভ্রমণ নিরাপদ আর আরামদায়ক করার জন্য বিমানবন্দরে কতজন কত সাবধানে কাজ করে যাচ্ছেন? আমরা দেখতে এসেছিলাম বলেই তো জানতে পারলাম।

চলো বিমান ওড়াই

সহজ কাজটাই আগে করি। চলো আগে ঘুড়ি ওড়াই। খেয়াল করে দেখেছ হয়তো বাতাসের একটু বেগ না থাকলে ঘুড়ি উপরে তোলা যায় না। তাই শান্ত বাতাসে তুমি নিজেই ঘুড়ি নিয়ে দৌড় দিয়ে ঘুড়ির জন্য একটা কৃত্রিম চলন্ত হাওয়ার সৃষ্টি করে থাকো। তবেই ঘুড়ি ওড়ে।

উপরে ওঠাবার সময় ঘুড়িকে রাখতে হয় খাড়া। তেরচা খাড়া ঘুড়ির পাশ দিয়ে যখন বেগবান বাতাস এগিয়ে যায় তখন কী হয় পর পৃষ্ঠার ছবিটা দেখলেই ভালো বুঝবে। ঘুড়ির গায়ে বাধা পেয়ে নিচের বাতাস অল্প জায়গায় ঘন হয়ে এগোয়। ওখানে তাই বাতাসের চাপ বাড়ে, যেই চাপ ঘুড়িকে উপরে ঠেলে ধরতে চায়। আর ঘুড়ির উপরের কিনারা ঘেঁষে বাতাস সোজা চলে যায়, ঘুড়ির গা আর এই বাতাসের মাঝখানে সে রেখে যায় একটা অপেক্ষাকৃত বায়ুশূন্য ফাঁকা জায়গা। এ-ধরনের ফাঁকা জায়গা থাকলে কী হয় তা তুমি হয়তো জানো। শরবতের নলে মুখ লাগিয়ে শুষে নিয়ে ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করলে যেমন করে শরবত তোমার মুখে উঠে আসে, ঘুড়ির উপরের ফাঁকা জায়গা তেমটি ঘুড়িকে উপরে শুষে তুলবে। এভাবে উপরে ওঠার শক্তিকে বৈমানিকরা বলেন লিফ্‌ট। আমরাও শিগ্‌গির বিমান ওড়াতে যাচ্ছি। তাই আমরাও এখন থেকে একে 'লিফ্‌ট' বলব।

ঘুড়িকে খাড়া রাখার জন্য একে সুতায় বেঁধে টানার দরকার হয়। ছোট একটা সুতা ঘুড়ির দু'জায়গায় বাঁধা থাকে যার সাথে বাঁধা হয় লাটাইয়ে জড়ানো লম্বা সুতা। এর টানে ঘুড়ি খাড়া থাকে। সুতা না বেঁধে একে তেরচা খাড়া রাখার জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হয় যাতে এটা নিজে-নিজেই খাড়া হতে পারে। প্রথমে ব্যাপারটা যাঁরা খেয়াল করেছিলেন তাঁরা ঘুড়ির কাগজের লেজটা বদলে সেখানে একটা লম্বালম্বি কাঠি লাগিয়ে দিলেন। আর কাঠির জন্য মাথায় লাগিয়ে দিলেন ছোট আর একটা ঘুড়ি, লেজ হিসেবে। যদি লেজের ঘুড়িটা না থেকে শুধু বড় ঘুড়িটাই থাকত সুতার সাথে না আটকানো অবস্থায়, তা হলে বাতাসের চাপে এটা খাড়া হয়ে শিগ্‌গির উলটে পড়ত। এর সামনের কিনারা ক্রমে উঠে আর পেছনের কিনারা ক্রমে নেমে গিয়ে এটা ঘটাত। কিন্তু পেছনে ছোট লেজের ঘুড়ি থাকলে এটা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে বড় ঘুড়ির মতো ছোট ঘুড়িও উপরের দিকে লিফ্‌ট পেতে চায়— এর ফলে কাঠির সাহায্যে বড় ঘুড়ির পেছনের কিনারাও উপরে তুলে ধরে— কাজেই এটা উলটে ঘুরে যেতে পারে না। এভাবে একধরনের মডেল 'ঘুড়ি-বিমান' বানানো সম্ভব হল, যা উলটেপালটে না গিয়ে ভাসতে পারে।

সামনের দিকে বা পেছনের দিকে ঝুঁকে উলটে-পড়া বন্ধ হল। কিন্তু পাশের দিকে কাত হওয়ার আশঙ্কা কিন্তু তখনও থাকে। প্রধান ঘুড়িকে বদলে দু'পাশে দু'টা ডানার ব্যবস্থা করলে এটা বন্ধ হয়। ডানা দু'টা পরস্পরের সাথে একটু কোণ করে উভয়েই একটু উপরের দিকে মুখ করে রইল— ফলে

সহজে কাত হতে পারে না এরা। পেছনে যে লেজের ঘুড়ি তার সাথে একটা হালও লাগানো হল যাতে করে বিমানটা সোজা সামনের দিকে যেতে পারে, এদিক-ওদিক না ঘোরে।

ডানা দুটা ঘুড়ির মতো সোজাসুজি তৈরি হলে, অথবা বেশি খাড়া থাকলে বেশ অসুবিধা হয়। বাতাস একে অতিক্রম করার সময় বাতাসের স্বাভাবিক মসৃণ প্রবাহ ভেঙে গিয়ে এতে ছোট ছোট ঘূর্ণির মতো অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। সেসব যেন একধরনের পিছুটানের সৃষ্টি করে বিমানের জন্য। আজকাল বৈমানিকরা এরকম পিছুটানকে 'ড্রেগ' বলেন, আমরাও তা-ই বলব। সোজা ডানার বদলে ডানার গা'কে যদি ঠিকমতো বাঁকা করে দেয়া যায় যাতে এর কিনারায় সরাসরি বাধা না পেয়ে বাতাস মসৃণভাবে এর উপর-নিচ দিয়ে চলে যেতে পারে তা হলে ড্রেগ কমানো যায়। বিমানের জন্য তা-ই করা হল। আজকাল আধুনিক বিমানে ডানার এই বাঁকানো রূপকে আরো উন্নত করা হয়েছে। এখন এর উপরের ও নিচের উভয় তলকে সুন্দরভাবে বাঁকিয়ে আনা হয় ড্রেগ কমাতে আর লিফ্‌ট বাড়াতে। এই রূপকে বলে 'এরোফয়েল'। এরোফয়েলের সুবিধা হল এতে উপরের বাতাসকে ঘুরে যেতে এবং নিচের বাতাসকে সোজা যেতে বাধ্য করে লিফ্‌টের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ ঘোরাপথে দ্রুত যেতে গিয়ে উপরের বাতাসের চাপ কমে যায় নিচের বাতাসের তুলনায়। অথচ এতে বাতাসের প্রবাহ ভেঙে গিয়ে ড্রেগের সৃষ্টি হতে পারে না।

রাইট ভাইরা ১৯০৩ সালে প্রথম বিমান উড়িয়েছিলেন এ-খবর হয়তো তুমি পেয়েছ। কিন্তু সেটা হল ইঞ্জিন লাগিয়ে ইচ্ছামতো অবিরাম বিমান চালাবার কথা। এর বহু আগে থেকেই মানুষ একধরনের বিমান বানিয়ে এসেছে, যেই ঘুড়ি-বিমানের কথা বলেছি, অনেকটা তার অনুকরণে। সেগুলো তারা উড়িয়েছে যাত্রীবিহীন অবস্থায়, এবং তাতে নিজে চেপে বসেও। অবশ্য সেগুলোতে ইঞ্জিন থাকত না— এদেরকে বলা হয় গ্লাইডার। এদের বানাতে গিয়ে বিমান ওড়াবার বহু কলাকৌশল তখন থেকেই জানা ছিল। আজও গ্লাইডার ওড়াতে মানুষের উৎসাহের কমতি নেই, বহু রকমের ইঞ্জিনওয়ালা বিমান থাকা সত্ত্বেও।

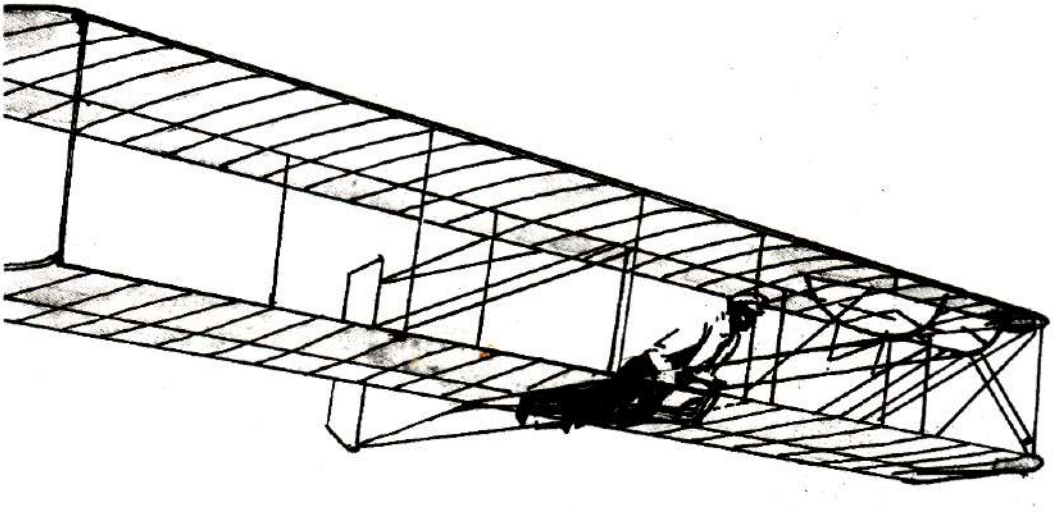

রাইট ব্রাদার্স-এর বাই প্লেন

ইঞ্জিন ছাড়া বিমান চলবে কী করে? এর একটা ব্যবস্থা গোড়াতেই হল। লম্বালম্বি যে কাঠির পেছনে লেজের ঘুড়ি লাগানো হয় সেই কাঠির নাকটা একটু ভারী করে দেয়া যাক। এতে করে বিমানের আগাটা ঝুঁকে পড়বে বটে, কিন্তু সাথে সাথে লেজের ঘুড়িটা যদি একটু খাড়া করে লাগানো হয় তা হলে তাতে বাতাস ধরে লেজকে নিচে নামিয়ে নাককে উপরে রাখবে। ফলে বিমান মোটামুটি ভূমি-সমান্তরাল থাকতে চাইবে। ভারী নাক নিচের দিকে পড়ে যেতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে এগুবে আর পেছনের লেজ ঝোঁকাটা বন্ধ করে বিমানকে সমান্তরাল রাখবে। যদিও অবশ্য শেষ পর্যন্ত এটা মাটিতে নেমে আসবে, তবুও নামার আগে বেশ খানিকক্ষণ এভাবে এটা বাতাসে আরামে ভেসে বেড়াবে। ১৮৯৬ সালেই লিলিয়েনথাল নামক এক ব্যক্তি এরকম একটা গ্লাইডারে ঝুলে নিজেই বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছেন বেশ খানিকক্ষণ। নিজে সামনের দিকে ঝুঁকে বা পেছনে সরে গিয়ে বিমানের নাক উঁচুনিচু করে তিনি তাঁর ওড়াটা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ঠিক এমনিতরো ওড়া আজকাল কোনো কোনো দেশে আবার খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্লাইডার থেকে ঝুলে থাকা হয় বলে একে বলা হয় হ্যাঙ গ্লাইডার। টেলিভিশনে হয়তো এমনটি তুমি দেখেছ। ঠিকমতো উপরমুখী বাতাস পেলে গ্লাইডার অনেকক্ষণ বাতাসে থাকতে পারে।

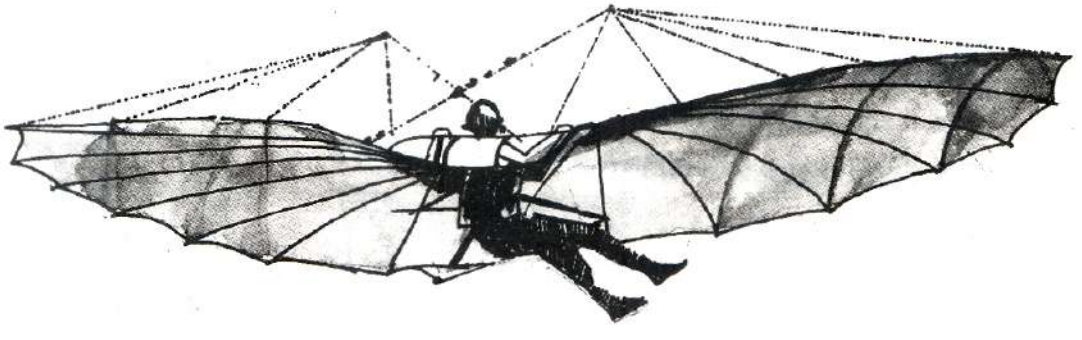

লিলিয়েন্থালের গ্লাইডার

বিমান ওড়াবার বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্লাইডারের ওপর হয়ে গেলেও সেটা সাময়িকভাবে ওড়ার শৌখিন জিনিস মাত্র। আসল বিমানের জন্য চাই সর্বক্ষণ এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো ইঞ্জিন। যাত্রীবিহীন বিমানের মডেলে বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত ফুরফুরি লাগিয়ে বিমান ওড়ানো হয়েছে ১৮৪৮ সালের দিকেই। সাঁতার কাটার মতো বাতাস টেনে এই যে ফুরফুরি বিমানকে এগিয়ে নিয়ে যায় তাকে বলা হয় প্রপেলার।

বিমান চালাবার জন্য হালকা অথচ দক্ষ ইঞ্জিন পাওয়া যাচ্ছিল না বলে যাত্রীসহ বিমান ওড়ানো যাচ্ছিল না। এই কাজটি করলেন দুই ভাই—অরভিল ও উইলবার রাইট। যে-বিমানটি তাঁরা প্রথমে বানালেন তাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ওড়ালেন—ঘুড়ির মতো। তারপর একে কিছু উন্নত করে এতে চেপে গ্লাইডারের মতো করে ওড়ালেন। তারপর ১২ হর্স পাওয়ারের একটা পেট্রোল ইঞ্জিন এর

সাথে জুড়ে দিয়ে দুটা প্রপেলার ঘোরালেন এতে। সেই প্রপেলারের শক্তিতে ১৯০৩ সালে অরভিল রাইট প্রথমবার মাত্র ১২ সেকেন্ডের জন্য বিমান চালালেন। তবুও সেটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম যন্ত্রচালিত মানুষ-নিয়ন্ত্রিত বিমানযাত্রা।

রাইট ভাইদের বিমানে উপরে ও নিচে দুটা ডানা ছিল। প্রথম দিককার অনেক বিমানে এরকম দুটা ডানা থাকত—এজন্য এদের বলা হত বাইপ্লেন। তখনকার বিমান পাশে কাত হতে চাইলে চালক একটা দড়ি টেনে ডানার আগাগুলো মুচড়ে ওঠানামা করাতেন। পরে অবশ্য ডানার আগায় দুটা ছোট দরজা কেটে সেগুলোই ওঠানামার ব্যবস্থা হল—এদের বলা হল এইলরন। খেয়াল করলে আজকালকার বিমানে তুমি এদের দেখবে। এইলরন উঠিয়ে-নামিয়ে বিমানকে ডানে বা বামে কাত করা যায়। বিমান অনাবশ্যকভাবে কাত হতে চাইলে তা বন্ধও করা যায়।

ঘুড়ি-বিমানের পেছনে যে ছোট একটা লেজ-ঘুড়ি লাগাতে হত তা তুমি দেখেছ। আসল বিমানে তাই লেজের কাছে লাগানো দুটা ছোট ছোট ডানা যা এই কাজ করে। নাক উঁচুনিচু করার জন্য পেছনের লেজ-ঘুড়িকে যে-রকম দরকারমতো খাড়া করতে হয়, নামিয়ে দিতে হয় তেমনি এখানেও পেছনের ছোট ডানায় দুটা দরজা কাটা হল যাদের নাম ইলেভেটর। এদের একটু তুলে বা নামিয়ে বিমান দরকারমতো নাক উঁচু করতে পারে বা নিচের দিকে ঝোঁকাতে পারে। লেজে খাড়া হালটাও অবশ্য থাকবে। হাল ডানে-বাঁয়ে ঘুরলে বিমান ডানে-বামে ঘোরে—ঠিক যেন নৌকার মতো। বিমানের হালকে বলা হয় রাডার। ঘুড়ি-বিমানের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখেছ— লেজের এই খাড়া অংশ বিমানকে সোজা চলতে দেয়, অহেতুক ডানে-বাঁয়ে না ঘুরে।

শুধু রাডার ব্যবহার করে বিমানকে ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে চাইলে বিমান কিন্তু পাশে সরে যেতে চাইবে। সাইকেলকে কাত না করে তুমি যদি বাঁক ঘোরার চেষ্টা করো যা হবে, এখানেও তা-ই হচ্ছে। তাই যেদিকে বিমান ঘোরাতে চাও, সেদিকে একে কাতও করা দরকার। ডানার আগায় যে এইলরনের কথা একটু আগে বললাম সেটি ব্যবহার করে বিমানকে কাত করা হয়।

বিমানে পাইলট হয়ে যখন বসবে তখন বাতাসে চলমান অবস্থায় তিন-তিনটি জিনিস তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পেছনের ছোট ডানায় ইলেভেটর— নাক উঁচু-নিচু করার জন্য ; রাডার— ডানে-বামে ঘোরার জন্য ; এইলরন— সাথে সাথে পাশে কাত করার জন্য। তোমার সামনে তাই এই তিনটাকেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সহজ উপায় থাকতে হবে। আসলে এই তিনটা জিনিসই তার দিয়ে পাইলটের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সাথে বাঁধা— ছোট বিমানের জন্য। বড় বিমানে সংযোগের ব্যবস্থাটা আরো জটিল। পাইলট হিসেবে তোমার সামনে থাকবে নিয়ন্ত্রণদণ্ড— যাকে বৈমানিকরা 'স্টিক' বা 'লাঠি' এই ছোট্ট ডাকনামে আদর করে ডাকে। স্টিকটা থাকবে তোমার কোলের কাছে, দুই হাঁটুর মাঝখান দিয়ে খাড়া। এর উপরের দিকে খোলা অর্ধ-বৃত্তাকার হ্যান্ডেলে তুমি দুই হাত রাখবে। স্টিকটা সামনে-পেছনে নিয়ে গিয়ে তুমি ইলেভেটরটা ওঠাতে-নামাতে পারবে। সাথে সাথে বিমান নাক-নিচু করবে বা উঁচু করবে। আর স্টিকটা ডানে-বাঁয়ে নিয়ে তুমি এইলরন নাড়াচাড়া করে ডানে-বামে কাত হতে পারবে। ঘোরাবার সময় একই সাথে রাডারের দিকেও নজর দিতে হবে। তাই রাডার ঘোরানোর কাজটা তুমি করবে পা দিয়ে একটা শোয়ানো দণ্ডকে এদিক বা ওদিক হেলিয়ে।

পাইলট হিসেবে তোমাকে লক্ষ করতে হবে তুমি কোনদিকে যাচ্ছ, তাই প্রয়োজন দিগ্‌দর্শক কম্পাসের। জানতে হবে কত বেগে তুমি যাচ্ছ, তাই স্পিডোমিটার। জানতে হবে মাটি থেকে কত

উঁচুতে আছ, তাই দরকার 'আলটিমিটার'। তা ছাড়া তোমাকে রেডিওর মারফত যোগাযোগ রাখতে হবে মাটির সঙ্গে যাতে করে আবহাওয়া ইত্যাদির খবরাখবর পেতে পারো।

স্টিক ব্যবহার করতে ভুল করলে কিন্তু বেশ অসুবিধা হতে পারে। যেমন ধরো তুমি বিমানের নাকটা অতিরিক্ত উঁচু করে ফেললে। এত খাড়া অবস্থায় ডানার উপরের কিনারা পার হয়ে বাতাস ডানার পিঠ থেকে দূরে দিয়ে যাবে। ফলে ডানার ঠিক পেছনে একটা শূন্য স্থান সৃষ্টি হয়ে বিমানকে পেছনে টেনে নিতে চাওয়ার একটা ড্রেগ তৈরি হল। বিমানের বেগ এভাবে কমে গেলে এর লিফ্‌টও যাবে কমে। বিমান চট করে নিচে পড়ে যেতে চাইবে। এরকম অবস্থাকে বৈমানিকরা বলেন 'স্টল' করা। এটা মারাত্মক হতে পারে। তাই আধুনিক অনেক বিমানে এই অবস্থায় ডানার সামনের দিকের কিনারায় ছোট একটা অংশ জানা সমতল থেকে উপরে তুলে ধরা যায়। এই দুই অংশের মাঝখান দিয়ে বাতাসকে পথ দেখিয়ে ডানার পিঠ ঘেঁষে নেবার জন্যই এই ব্যবস্থা। এভাবে পিছুটান কমিয়ে স্টলিং বন্ধ করা সম্ভব হয় জরুরি অবস্থায়।

বিমান মাটিতে নামার সময় এর গতিবেগ অনেক কমিয়ে আনতে হয়, নইলে এটা নামার রাস্তা ছাড়িয়ে চলে যাবে। অথচ আস্তে চালালে বিমানের লিফ্‌ট কমে গিয়ে এটা সজোরে মাটিতে সরাসরি পড়ে যেতে চাইবে। উভয় দিকেই বিপদ! এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামার সময় বিমানের ডানার পেছনের কিনারার খানিকটা অংশ নিচের দিকে যথেষ্ট বাঁকা করে দেয়া যায়। এতে খানিকটা বাড়তি লিফ্‌টের সৃষ্টি হয় ডানায়, অপেক্ষাকৃত কম গতিতেও প্রয়োজনীয় লিফ্‌ট বজায় থাকতে পারে। সাথে সাথে বাতাস ধরে একটা ব্রেকের কাজও করে এটা গতি দ্রুত কমিয়ে আনার জন্য। বাঁকানোর এই অংশটিকে বলা হয় 'ফ্ল্যাপ'।

ড্রেগ অর্থাৎ 'পিছুটান' যথাসম্ভব কমানোই হচ্ছে বিমান-নির্মাতার বড় সমস্যা। নইলে যথেষ্ট গতি পাওয়া যাবে না, কাজেই লিফ্‌টও পাওয়া যাবে না। চুরুটের আকারে মসৃণদেহী করে বিমানকে তৈরীর কারণই হচ্ছে বাতাসের ঘর্ষণ কমিয়ে, ড্রেগ কমানো। এই একই কারণে বড় বিমানগুলোতে বাতাসে ওঠার পরপরই তার চাকাগুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়া হয়, যাতে করে সেখানে অপ্রয়োজনীয় এই চাকা বাতাস আটকে কিছু বাড়তি ড্রেগ সৃষ্টি না করে। অবশ্য নামার আগে যথাসময়ে এই চাকা বের করে নিতে হয়। বিমানকে যে চাকার উপরই নামতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পানিতে নামার 'সি-প্লেনগুলোতে নিচে চাকার বদলে নৌকার মতো জিনিস থাকে। আবার বরফের উপর নামতে হলে থাকে শ্লেজগাড়ির মতো 'স্কি'।

একেবারে গোড়াতেই দেখেছি ঘুড়িই হোক, আর বিমানই হোক এর উপর দিয়ে বাতাসের যথেষ্ট বেগ না থাকলে এটা উড়বে না, লিফ্‌ট পাবে না। ওড়ার শুরুতে মাটির উপর দিয়ে যথেষ্ট বেগে না দৌড়ে গেলে বাতাসের এই বেগ পাওয়া যাবে না। আগেকার দিনের হালকা দোতালা-ডানার বাইপ্লেনগুলো ঘণ্টায় ৩০/৪০ মাইল বেগে গেলেই উড়ে যেত। এখনকার বড় ভারী বিমানের অন্তত ঘণ্টায় ৮০/৯০ মাইল বেগ না হলে ওটা মাটি ছেড়ে উঠতে পারে না। এই বেগ পেতে হলে সোজা লম্বা রাস্তায় দু-এক মাইল দৌড়ে না গেলে চলে না। তাই দরকার বিমানবন্দরের, দৌড়াবার রাস্তা 'রানওয়ের'। নামার জন্যও এটার দরকার। মাটি ছোঁয়ার পর গতি কমিয়ে থেমে যাওয়ার জন্যও এরকম অনেকখানি পথ চলে যেতে হয়। ওঠানামার সময় এমনিতেই যদি বাতাসের কিছু বেগ থাকে বিমানের সামনে থেকে পেছনে তা হলে ঐ বেগটুকু না চলেই পাওয়া গেলে ফাউ। তাই চেষ্টা করা হয় বাতাসের

প্রবাহের বিপরীত দিক থেকে উঠতে। এইজন্য বিমানবন্দরে লম্বা বেলুনের মতো একটা জিনিস উড়ে বাতাসের দিকনির্দেশ করে— যেন সহজে সবাই দেখতে পায়।

সব বিমানই কি সামনে প্রপেলার ঘুরিয়ে চলে? মোটেই না। আমাদের দেশের ভেতরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে ছোট বিমানগুলো এরকম প্রপেলার দিয়ে চলে বটে, কিন্তু বিদেশে যেসব বোয়িং ঢাকা থেকে যায় সেগুলো চলে জেট ইঞ্জিনে। ফোলানো বেলুনকে ছেড়ে দিলে পেছনের দিকে হাওয়া ছেড়ে সেটা যেভাবে সামনে এগিয়ে যায়, জেট ইঞ্জিন কাজ করে অনেকটা সেভাবে। যথেষ্ট শক্তিতে পেছনে উচ্চচাপে গ্যাস ছেড়ে এটা সামনে এগোয়। জ্বালানি পোড়ার জন্য নিতে হয় সামনের থেকে বাতাস। বাতাসহীনভাবে একই উপায়ে চলার জন্য লাগে রকেট ইঞ্জিন, যা বায়ুমণ্ডলের বাইরেও চলতে পারে—ওর জ্বালানি পোড়ার বাতাস ওর সাথেই থাকে।

একটু আগেই বলেছি সামনের দিকে যথেষ্ট না দৌড়ে বিমানের ওঠা বা নামা সম্ভব নয়। হেলিকপটার কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সোজা উপরে উঠতে পারে, সোজা নামতে পারে। এমনকি উপরে উঠে এটা এক জায়গায় স্থির হয়েও থাকতে পারে! এটা কী করে সম্ভব হয়? হেলিকপটারে ডানা বিমানের মতো এর গায়ে স্থির লেগে থাকে না, বরং হরদম ঘুরতে থাকে মাথার উপরে। তিন বা চারটা পাখাওয়ালা এই ঘুরন্ত ডানাকে 'রোটোর' বলা হয়। ঘোরার ফলে ডানার উপর বাতাসের বেগ সৃষ্টি করতে বা বজায় রাখতে এখানে পুরো বিমানকে চলতে হচ্ছে না। রোটোর নিজে ঘুরেই পুরো হেলিকপটারের জন্য লিফ্‌ট সৃষ্টি করছে। মাটি থেকে উপরে উঠতে হলে রোটোরকে শুধু লিফ্‌ট পাবার মতো জোরে ঘুরিয়ে দিলেই হল। উপরে উঠে রোটোর যতক্ষণ সমান্তরালভাবে ঘুরবে ততক্ষণ হেলিকপটার এক জায়গাতেই ঝুলে থাকবে। এবার রোটোরকে সামান্য একটু সামনের দিকে কাত করে দিলে লিফ্‌ট বজায় রাখার সাথে সাথে এটা সামনের দিকে এগোবার প্রপেলার হিসেবেও কাজ করবে। বিমানের চেয়ে ধীরে হলেও হেলিকপ্‌টার এভাবে বেশ বেগে সামনে এগোতে পারে।

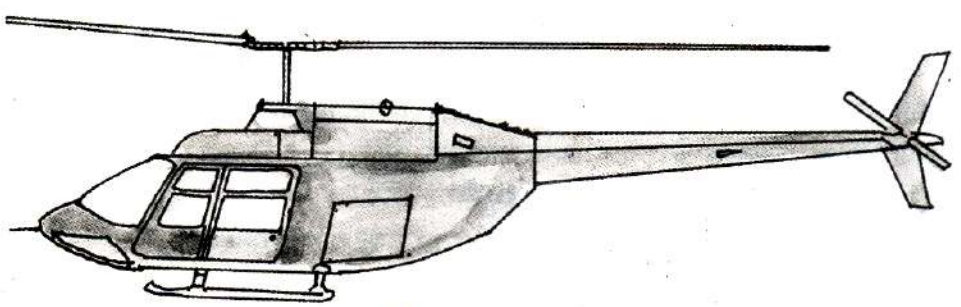

বিভিন্ন রোটর বিশিষ্ট হেলিকপ্টার

হেলিকপটারের রোটোর যখন একদিকে ঘোরে তখন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মে হেলিকপটারটা নিজে নিজে এর বিপরীত দিকে বনবন করে ঘুরতে চাইবে। এটা কোনো কাজের কথা হল না, তাই এটা বন্ধ করতেই হবে। খুব বড় হেলিকপটারে দুটা রোটোর দিয়ে তার একটাকে অন্যটার বিপরীত দিকে ঘোরালে লিফ্‌টও দ্বিগুণ হয়, অথচ প্রতিক্রিয়া কাটাকুটি হয়ে যায়। ছোট হেলিকপটারের অত শক্তি থাকে না দুটা রোটোর লাগাবার। তাই সেখানে বেশ লম্বা একটা লেজের ব্যবস্থা করে তার মাথায়

খাড়া একটা ছোট পাখা ঘোরানো হয়। রোটোরের প্রতিক্রিয়ায় হেলিকপটার যেদিকে ঘুরতে চাইবে এই পাখা প্রপেলারের মতো বাতাস টেনে লেজের মাথা তার বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে চাইবে। ফলে হেলিকপটার কোনোদিকে না ঘুরে সোজা থাকে।

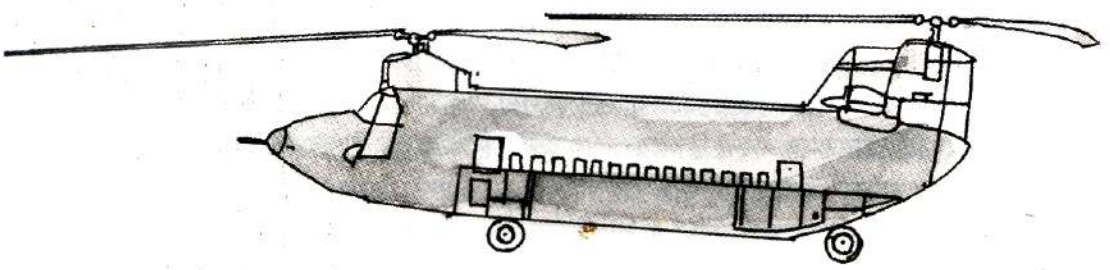

আজকাল অবশ্য সমরাস্ত্রের প্রয়োজনে খাড়াভাবে ওঠার দু'একটি জঙ্গি বিমান উদ্ভাবিত হয়েছে। সেখানে শক্তিশালী জেট ইঞ্জিনকে চাঁদে যাবার রকেটের মতো খাড়া করে দিয়ে এটা সম্ভব হয়েছে।

বিমান কত জোরে ছুটতে পারে? অনেক জোরে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর মিগগুলোকে শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত উড়ে যেতে তোমরা কেউ-কেউ হয়তো দেখেছ। আজকাল বড় যাত্রীবাহী বিমানও পৃথিবীর নানা জায়গায় চলাচল করছে ঐরকম গতিতে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ? তুমি চিৎকার করলে তার শব্দ কোথাও পৌঁছার আগেই বিমানটা পৌঁছে যাবে! হয়তো দেখলে বিমানটা তোমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। এটা দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরেই শুনতে পেলে তার বিরাট আওয়াজ! শব্দের গতি মানে বাতাসের সঙ্কোচন-প্রসারণের গতি। ঠিক শব্দের গতিতে চলার সময় বিমানের সামনে বাতাসের দেয়াল সামনে সরে যাবার সময় পায় না, ফলে বাতাসের দেয়ালে প্রচণ্ড বেগে এসে পড়া বিমানের কারণে বাতাসে একটা বিরাট শক্ বা ধাক্কা লাগে। মস্ত একটা আওয়াজও পাওয়া যায় সে-সময়— যাকে বলা যায় সোনিক বুম বা শব্দবোমা। ঘরবাড়ি থরথর করে কাঁপাতে পারে এই শব্দবোমা। বিমানের জন্যও ব্যাপারটা খুব নাজুক। শব্দের গতি অতিক্রম করতে বিমানকে এসব মারাত্মক পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। কাজটা মোটেই সহজ হয়নি।

ঘুড়ি থেকে শুরু করে বিমান ওড়াবার নানান দিকের কথা আলোচনা হল। তুমি কি এরকম কোনো বিমান কোনোদিন চালাবে? হয়তো চালাবে, হয়তো চালাবে না। কিন্তু যদি এর মূল বিষয়গুলো বোঝো, কোলের কাছে স্টিক হাতে নিজকে পাইলট হিসেবে কল্পনা করতে পারো, জানো পাইলট কী করলে কী হয়, কেন হয়, বিমানচালনার অনেক আনন্দ তুমি এমনিতেই পেয়ে গেলে। তা ছাড়া তোমার জ্ঞানের পরিধি এতে কিছু বেড়ে গেল, তোমার ছোট্ট আবাসটি ছাড়িয়ে তোমার জ্ঞান তোমাকে নিয়ে গেল তেপান্তরের রাজ্যে।

যেদিন তুমি মহাকাশে যাবে

এ-পর্যন্ত মহাকাশে যাঁরা গেছেন তাঁরা মাত্র গুটিকয়েক ভাগ্যবান। তবে এমনটি বেশিদিন থাকবে না। তোমরা যখন বড় হবে, তখন আরো অনেক মানুষ আকাশে যাবে— নিয়মিতই যাবে। হয়তোবা তোমাদেরও কেউ-কেউ সেদিন মহাকাশে পাড়ি দেবে নানান কাজে। এমনই দিনের শুরু হিসেবে মহাকাশে একটা পাকাপোক্ত ল্যাবোরেটরি বানাবার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওটা মহাকাশে থাকবে আর পৃথিবী থেকে নানান বিজ্ঞানীনই দরকারমতো সেখানে গিয়ে কিছুদিন থেকে কাজ করে আবার ফিরে আসবেন—যেমন করে দেশের বিজ্ঞানী বিদেশের ল্যাবোরেটরিতে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন, অনেকটা তেমনি। একদিন যেতে যখন হতে পারে, কেমন হবে সে-যাওয়া আগেভাগে একটু জেনে নিতে দোষ কী?

তোমার যাত্রা শুরু হবে একধরনের ফেরি-রকেটে। পুরো সফরের তুলনায় এটা তোমাকে নিয়ে যাবে সামান্য পথ—পৃথিবী থেকে কাছেই একটা মহাকাশ-স্টেশনে। স্টেশনটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চাঁদের মতো। তবে ফেরি-রকেটটিকে অবশ্য খুব শক্তিশালী হতে হবে, পৃথিবীর টানটুকু কাটানো চাই তো! এতে এসে বসতেই আসনের সাথে বেল্ট দিয়ে তোমাকে ভালো করে বাঁধা হবে যাতে কিছুতেই না ছিটকে যেতে পারো। এবার রকেটের দরজা বন্ধ হতেই, মহাগর্জনে প্রচণ্ড বেগে ওঠার পালা।

ঘাটে লঞ্চ ভিড়বার মতোই একটু কায়দা-কানুন কসরত করে তোমার ফেরি-রকেটটি গিয়ে লাগবে মহাকাশ-স্টেশনের সাথে। তুমি যদি আরো দূরের যাত্রী হও তবে স্টেশনে তোমাকে গাড়ি বদলাতে হবে। চড়তে হবে আর একটা দূরপাল্লার রকেট-জাহাজে। কত বড় সেই জাহাজ? তা নির্ভর করবে কত দূরে তুমি যাচ্ছ তার ওপর। যদি কাছেই চাঁদে যেতে হয় তা হলে জাহাজটি ছোটই হবে। তবে অন্যান্য গ্রহ যদি হয় তোমার গন্তব্য, তা হলে রকেট-জাহাজটিকে হতে হবে যথেষ্ট বড়।

যেখানেই যাও, মহাকাশ-স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করায় আগুনের ছটা আর তর্জন-গর্জন তেমন কিছুই হবে না, যেমনটি হয়েছিল পৃথিবী ছাড়ার সময়। কারণ পৃথিবীর মতো বিরাট টানটুকু না থাকাতে ওটা কাটাবার ঝামেলাও সেখানে নেই। তাই অনায়াসে প্রচণ্ড গতিতে পৌঁছে যাবে তোমার জাহাজ— হয়তোবা ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে। তুমি অবশ্য এই প্রচণ্ড বেগের কিছুই টের পাবে না, শুধু বেগ বাড়া বা কমার সময়টিতে ছাড়া। অবাক হচ্ছ? না, অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের পৃথিবী যে আমাদেরকে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে সূর্যের চারদিকে ছুটছে তা কি আমরা টের পাই?

রকেট-জাহাজের ভেতরে তোমার ক্যাবিনের অবস্থাটা কী দেখা যাক। যদিও বাইরে জোরালো রকেট-ইঞ্জিন চলছে তার শব্দ কিন্তু তোমার কানে আসবে না। কারণ ওখানে শব্দ বয়ে আনার বাতাস যে নেই! শুধু জাহাজের ভেতরের ছোটখাটো যন্ত্রগুলোর শব্দ তুমি পাবে। ওখানে একটা বড় অসুবিধা

তুমি যেটা বোধ করবে তা হল তোমার ওজন বলতে কিছুই থাকবে না। আসনের বেল্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করলেই দেখবে তুমি পালকের মতো ভাসতে চাইছ। একটু ঠেলা খেলে তো চললে ক্যাবিনের ছাদের দিকে, কি দেয়ালের দিকে খেলে ধাক্কা। বড় বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা এটা। বিশেষ ধরনের জুতো তোমাকে পরতে হবে হাঁটাচলার জন্য। চুম্বকের টানে হয়তো জুতোটা মেঝের সাথে লেগে থাকতে চাইবে—অথবা চটচটে কোনো আঠার টানে।

খাবারদাবারের কী হবে? বিমানে ভ্রমণের সময় যেমন ট্রেতে খাবার তোমার সামনে দিয়ে যাওয়া হয় ওখানে কিন্তু তেমনটি হবার যো নেই। তা হলে খাবারগুলো ট্রে থেকে উঠে এদিক-ওদিক চলে যাবার আশঙ্কা আছে। পানিটাও যে গ্লাসে থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তুমি তো আর সারাঘর তাড়িয়ে বেড়িয়ে খাবার খেতে চাইবে না! তাই বিশেষভাবে তৈরি খাবার টুথপেস্টের টিউবের মতো জিনিসের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। ওটা টিপে টিপে খাবার বের করে তুমি মুখে পুরবে।

আরো অসুবিধার ব্যাপার ঘটবে কিছু-একটা ঘোরাতে গেলে। যেমন ধরো, দরজার হাতলটা ডান দিকে ঘোরাতে চাইলে আর অমনি ওর প্রতিক্রিয়ায় তোমার পুরো শরীরটা বাম দিকে ঘুরতে শুরু করে দিল চাকার মতো। ওখানে তো আর পৃথিবীর টান নেই তোমাকে খাড়া রাখার জন্য। ঐ টান চটচট জুতো ছাড়া তোমার কোনো গতি নেই।

এতসব হাঙ্গামার মধ্যেই তোমাকে মহাকাশ-জাহাজে কাটাবার অভ্যাস করে নিতে হবে। গন্তব্যস্থানে এই জাহাজ তোমাকে সরাসরি পৌঁছিয়ে দেবে না। চাঁদ বা অন্য গ্রহের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেলে তোমাকে আবার জাহাজ বদল করে আরেকটা ফেরি-রকেট ধরতে হবে। এই বদলাবদলির জন্য খুব সম্ভব ওখানেও থাকবে একটা মহাকাশ-স্টেশন। ফেরি-রকেট তোমাকে নিয়ে আস্তে গিয়ে নামবে চাঁদের বুকে, কি গ্রহের বুকে কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায়। ও-জায়গায় তখন হয়তো থাকবে কিছু মানুষের বসত, অন্তত কিছু বিজ্ঞানীর। অদ্ভুত এক সফরের পর ওখানে শুরু হবে তোমার আরো বহু মজার মজার অভিজ্ঞতার। এই সফরের শেষে গিয়ে দেখবে আমাদের পৃথিবী তখন তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আকাশে রোজ এটা তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সুন্দর একখানি গোলকের আকারে।

তুমি দেখবে আর বলবে, ওই তো ঐখানে আমার বাড়ি— ঐ সুন্দর আলো বাতাস পানিতে ভরা গ্রহটি আমারই গ্রহ!

উল্কাপাত

যখন খুব ছোট ছিলাম, গরমের দিনে বাড়ির ছাদে ঘুমাতাম ভাইবোনদের সাথে। তখন আমাদের একটা খেলা ছিল একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা। হঠাৎ-হঠাৎ দেখতাম এক-একটা তারা একদিকে ছুটে গিয়ে যেন নিভে গেল মুহূর্তের জন্য একটি আলোর রেখা সৃষ্টি করে। যে-ই দেখতাম চিৎকার করে অন্যদের দেখাতাম। এ নিয়ে আমাদের কত কথা! কেউ বলতাম, 'আকাশে তারা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে', কেউ বলতাম, 'নানি বলেছে ওটা শয়তানকে দোর্‌রা মারা হচ্ছে'— এমনি কত কী!

উল্কাপাত

পরে বুঝেছি, এগুলো তারা বা দোর্‌রা মারা কোনোটাই নয়। ছোট্ট একটা পাথর মহাকাশ থেকে ছুটে এসে পৃথিবীর বাতাসে এসে ঢুকে জ্বলে উঠে এই কাণ্ডটা ঘটায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাথরটা একটা পুঁতির দানার চেয়ে বড় নয়— দু'এক মিলিমিটার ব্যাস। অথচ এইটুকু জিনিসই যখন প্রচণ্ড বেগে সেকেন্ডে ৪৫ মাইলের মতো বেগে ছুটে এসে বাতাসের সাথে ঘষা খায়— উত্তাপে এটা এমনভাবে

জ্বলে ওঠে যে আমরা একে ছুটন্ত তারা হিসাবে দেখতে পাই। এরাই উল্কা। এর মধ্যে কিছু-কিছু খানিকটা বড়— যেমন মার্বেল সাইজের হয়, সেগুলো তো খুবই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। এসব বড় বড় উল্কা এক-এক সময় আকাশে আতশবাজির দৃশ্য সৃষ্টি করে।

যে-কোনো রাতে তুমি যদি পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকো তা হলেও দু'-একটা উল্কাপাত দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। আসলে সারা পৃথিবীতে ২৪ ঘণ্টায় আড়াই কোটি উল্কাপাত দেখা যায় ; দেখা যায় না এমন আরো অসংখ্যকে বাদ দিলেও। তবে এরা আকারে খুব ছোট বলে এতসব উল্কাপাথর এসে পড়া সত্ত্বেও এর ফলে পৃথিবীর ওজন বাড়ছে গড়ে মাত্র দিনে এক টন করে।

উল্কাগুলো আমাদের কাছ থেকে কত দূরে থেকে জ্বলে ওঠে? সাধারণত এরা ৬৫ মাইল উপরে থাকতে জ্বলা শুরু করে আর ৫০ মাইল উপরে আসতে আসতে জ্বলে প্রায় ছাই হয়ে যায়। তাই মুহূর্তমাত্র আমরা এদের জ্বলন্ত ও ছুটন্ত অবস্থায় পাই। ঐ জ্বলার সময়টুক ছাড়া এত ছোট জিনিসকে এত দূর থেকে দেখতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমরা হয়তো জানতে চাইবে এমন ছোট ছোট পাথর কোথা থেকে উড়ে পৃথিবীতে এসে ছাই হচ্ছে? তা হলে বলতে হয় আমাদের যেমন পৃথিবী আর অন্যান্য গ্রহ মঙ্গল, বুধ, শুক্র ইত্যাদি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এই এক-একটি উল্কা-পাথরও সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর বা অন্য গ্রহের মতো তেমনি তাদেরও রয়েছে ঘোরার নির্দিষ্ট কক্ষপথ। নেহাত ছোট্ট জিনিসটি বলে এক-একটি উল্কার কক্ষের খবর ভূগোল বইতে রাখা হয় না, তাদের নাম-ধাম আলাদা নেই। কক্ষপথে চলতে গিয়ে এক-একটা উল্কা-পাথর যখন পৃথিবীর বায়ুর আওতায় এসে ঢুকে পড়ে তখনই হয় উল্কাপাত।

উল্কাগুলো যে উপরে বায়ুমণ্ডলে থাকতে থাকতেই জ্বলে ছাই হয়ে যায় এটা আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্যের কথা। নইলে কী ভয়ানক ব্যাপার হত বলো দেখি! প্রতিদিন কোটি কোটি নুড়িপাথর সজোরে পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ে একে ক্ষতবিক্ষত করত। এই চাঁদ বেচারার কথাই ধরো না কেন। তার গায়ে বাতাসের বর্ম নেই বলে যুগ যুগ ধরে উল্কা পড়ে তার কী হাল হয়েছে ! ঐ যে চাঁদের পানি ছাড়া সাগরগুলো যেগুলো আমরা কলঙ্করূপে দেখি সেগুলো কিন্তু অমনি বড় বড় উল্কার আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অতখানি না হলেও বিরাট কিছু উল্কা-পাথর পৃথিবীতেও এসে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকম ৬০ টন ওজনের একটা উল্কা দেখা গেছে। আমেরিকার আরিজোনায় উল্কা-পাথরের ফলে একটা বিশাল খাদ সৃষ্টি হয়েছে যার ব্যাস প্রায় এক মাইলের মতো আর গভীরতা ৬০০ ফুট। এখানে যে-উল্কা পড়েছিল সেটা অবশ্য টুকরা টুকরা হয়ে ছিটিয়ে গেছে। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ায় এক উল্কাপাতের ফলে বিশাল বনভূমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীতে যেসব উল্কা-পাথর পাওয়া গেছে তার শতকরা নব্বই ভাগ সাধারণ পাথরের মতো জিনিস হলেও অন্য দশ ভাগ লোহা ও খানিকটা নিকেল ধাতুর তৈরি। মনে করা হয় প্রাচীন যুগে মানুষ এমন উল্কা-পাথর থেকে প্রথম লোহার ব্যবহার শিখেছিল—খনি থেকে লোহার আকরিক নিয়ে নয়।

রাতের আকাশে আতশবাজি সৃষ্টি করে যেসব ক্ষণস্থায়ী উল্কা তার মধ্যে কেউ-কেউ যে সশরীরে আমাদের কাছে হাজির হয়, ভাবতেই কেমন লাগে।

সাবানের বুদবুদ

খুব হাসি পাচ্ছে, না? সাবানের বুদবুদ নিয়ে আবার এত কথা বলার কী আছে? ও তো আমরা কতই বানিয়েছি। এই আছে তো এই নাই। কিইবা গুরুত্ব তার? কথাটা কিন্তু তোমার ঠিক হল না। গুরুত্ব তো আছেই, কাজটা তেমন কিছু সহজও নয়। দেখো না চেষ্টা করে খুব বড়, সুন্দর এবং স্থায়ী একটা

সাবানের বুদবুদ

বুদবুদ ফোলাতে। বেশ হাত না পাকালে কিন্তু পারবে না। সাধারণ লোক তাচ্ছিল্যভরে বলে, "ও বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল।" অথচ বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন কী বলেছেন শোনো—"সাবানের একটা বুদবুদ ফুলিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করো। এটাকে বুঝতে পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দেওয়া যায়, আর ঐ কাজের পদেপদে পদার্থবিদ্যার অসংখ্য পাঠ নেওয়া হতে থাকবে।"

সাবান-বুদবুদের পাতলা পর্দার গায়ে রঙধনুর যে বাহার দেখা যায় সেখান থেকে পদার্থবিদ মাপতে পারেন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ঐ অতি দুর্বল পদার্থটিতে যে টানাপোড়েন রয়েছে—তার গবেষণা থেকে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া সম্ভব অণুর সাথে অণুর আকর্ষণ সম্পর্কে। এই আণবিক আসক্তিটুকু না থাকলে আমরা কেউই থাকতাম না, বিশ্বে কিছুই থাকত না বিচ্ছিন্ন অণুর কণিকা ছাড়া। এখানে তো আর পদার্থবিদদের ঐসব বড় বড় গবেষণার খবর দেওয়া যাবে না, তবে সাবানের বুদবুদ নিয়ে তোমরাই করতে পারো এমন কিছু মজার কাজের খবর তোমাদের দিতে পারি। মজার কাজ হলেও কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ। পদার্থবিদ চার্লস বয়েজ 'সাবানের বুদবুদ' নামে একটি অত্যন্ত চমৎকার বইই লিখেছেন এমনিতরো নানা কাজের উপর। কাজগুলোতে বেশকিছু কায়দা-কানুন রয়েছে বইকী।

সাধারণ কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়েই এগুলো তুমি করতে পারো। তবে যেসব সাবানে তেল ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলে আরো ভালো। ভালো বুদবুদের জন্য সাবান গোলাতে কি পানি ব্যবহার করলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। খুব পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি নিতে হবে। সরাসরি সংগৃহীত বৃষ্টির পানি হলে ভালো হয়। নইলে ফুটিয়ে-নেওয়া পানি ঠাণ্ডা করে নিলেই চলবে। এরকম পানিতে বেশ ঘন করে সাবান গুলিয়ে নিতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী বুদবুদ পাওয়ার জন্য এর আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ গ্লিসারিন-এর সাথে মিশিয়ে নাও। মিশ্রণের উপর যে-ফেনা আর বুদবুদ জমবে তা একটা চামচ দিয়ে কাচিয়ে তুলে ফেলো।

বুদবুদ ফোলাবার জন্য একটা সরু নল প্রয়োজন। মাটির তৈরি নল হলে ভালো হয়। এরকম নলের যে-প্রান্তটা সাবানপানিতে ডোবানো হবে তার ভেতর বাইরে আগে থেকে কিছু সাবান মাখিয়ে নিতে হবে। তা ছাড়া ১০ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা স্ট্র-নলও ব্যবহার করা যায়—কোকাকোলা বা শরবত খেতে যেগুলো ব্যবহার করা হয়। এরকম নলের মাথাটি একটুখানি ফালিয়ে নিতে হবে।

নলটির প্রান্ত সাবানপানিতে ডুবিয়ে খাড়াভাবে ধরো যাতে এখানে সাবানের একটা পর্দা পড়তে পারে। এবার সাবধানে ফুঁ দিতে থাকো। যে-বুদবুদটা তৈরি হবে তার ভেতর তোমার ফুসফুস থেকে যাওয়া হাওয়া থাকবে যা ঘরের হাওয়ার চেয়ে গরম বলে অপেক্ষাকৃত হালকা। তাই বুদবুদটা উপরে উঠে যাবে। প্রথম চোটেই তুমি যদি ১০ সেন্টিমিটারমতো ব্যাসের বুদবুদ তৈরি করতে পারো তা হলে তোমার তৈরি সাবানপানি ভালোই হয়েছে বলতে হবে। তা নইলে আরো কিছু সাবান এতে গুলিয়ে নিতে হবে? আরো একটা পারীক্ষা অবশ্য করা দরকার। বুদবুদটা তৈরি হবার সময় সাবানপানিতে আঙুল ডুবিয়ে ওটাকে ফুটো করে দেবার চেষ্টা করো। ওতে যদি ফেটে যায় তা হলে সাবানপানি সঠিক হয়নি, আরো সাবান গোলাতে হবে। এসব ঠিক হবার পর, বুদবুদ নিয়ে কয়েকটি কাজ করতে পারো।

ফুলকে ঘিরে বুদবুদ

একটা প্লেটের উপর কিছু সাবানপানি নাও যেন ওটা কয়েক মিলিমিটার পুরু হয়ে থাকে। প্লেটের মাঝখানে একটা ফুল রাখো আর ফুলটা একটা উল্টানো কাচের ফানেল দিয়ে ঢেকে দাও। খুব ধীরে ফানেলটি তোলো আর ফুঁ দিয়ে ওর নিচে থেকে একটা বুদবুদ ফুলিয়ে নাও। দেখবে ফুলটি সুন্দর একটি অর্ধ গোলাকৃতি বুদবুদের ভেতর রয়ে গেছে। বুদবুদের গায়ে রংধনুর সব রং দেখা যাচ্ছে।

ফুলের বদলে একটা পুতুল নিয়ে তুমি আরো মজার কাণ্ড করতে পারো। পুতুলটার মাথার উপর কিছু সাবানপানি ঢেলে দাও। এবার বুদবুদকে ফুটো করে এর ভেতর পুতুলের মাথার চতুর্দিকে আর একটি ছোট বুদবুদ ফোলাতে পারো। এ যেন মহাশূন্য-চারীদের স্বচ্ছ হেলমেটের মতো!

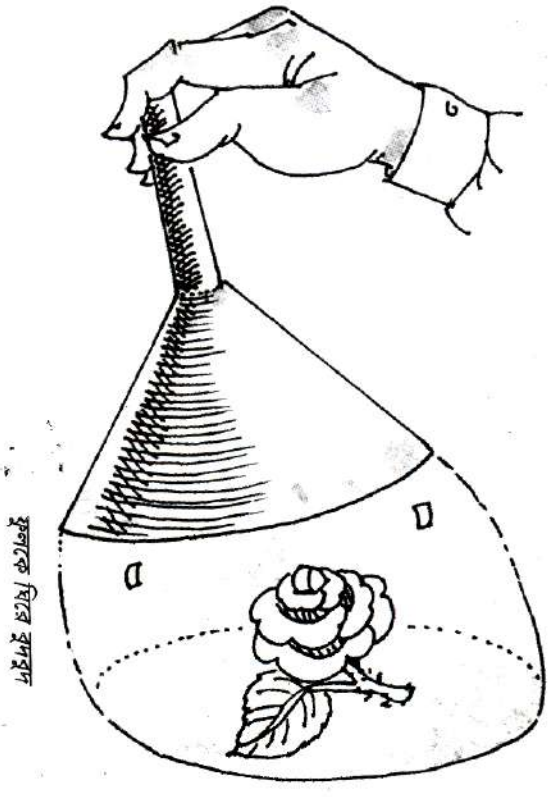

একের ভেতর আরো বুদবুদ

ফানেল ব্যবহার করে আগের মতো একটা বড় বুদবুদ ফুলিয়ে নাও। এবার সাবান-পানির মধ্যে একটা স্ট্র-নল প্রায় পুরোটা ডুবিয়ে দাও শুধু তোমার মুখে দেবার কিনারটাকে শুকনো রেখে। বড় বুদবুদটার দেওয়ালের মধ্যে নলটা সাবধানে গুঁতো দিয়ে এর কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাও। এবার নলটা পেছনে এনে দ্বিতীয় আর একটা বুদবুদ ওর ভেতরে ফোলানো সম্ভব। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ— এমনি করে আরো।

বেলনাকৃতির বুদবুদ

বেলন বা পিপের মতো দেখতে একটা বুদবুদ সৃষ্টি করা যায় দুটি তারের রিঙের মাঝখানে। প্রথমে একটা রিঙের উপর সাধারণ একটি গোলাকৃতির বুদবুদকে বসাও। এবার সাবানপানিতে ভেজা দ্বিতীয় রিংটি ঐ বুদবুদের উপর লাগাও। এবার উপরের রিংটিকে তুলতে থাকলে ওটা সাথে করে নিয়ে গিয়ে বুদবুদটিকেও লম্বা ও বেলনাকৃতি

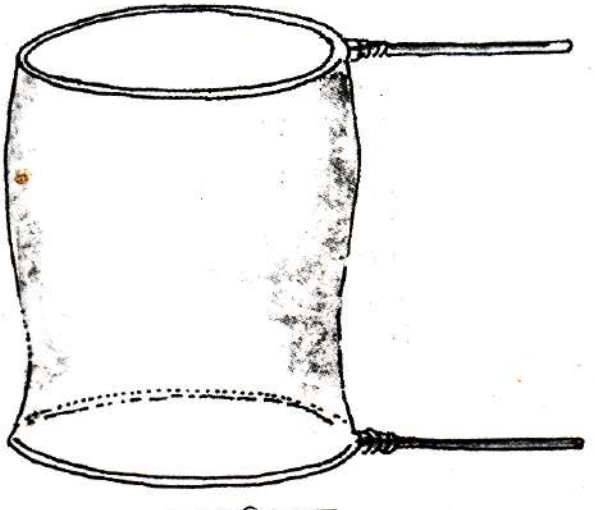

বেলনাকৃতির বুদবুদ

করে তুলবে। এভাবে আরো লম্বা করে যদি উপরের রিংটিকে রিংগুলোর পরিধির দৈর্ঘ্যের থেকেও বেশি দূরে নিয়ে যাও, তা হলে বেলনের এক প্রান্ত অন্য প্রান্ত থেকে মোটা হবে এবং তা দুটা আলাদা বুদবুদে বিচ্ছিন্ন হবে।

পৃষ্ঠটানের একটা প্রমাণ

সাবান-বুদবুদের পর্দাটা সবসময় একটা টানের অবস্থায় থাকে যাকে বলা হয় পৃষ্ঠটান। এই টানের ফলে বুদবুদের দেওয়াল ভেতরের বাতাসকে সবসময় একটা চাপে রাখে। ফানেল বা নলের অন্য খোলা মুখটা একটা মোমবাতির শিখার দিকে মুখ করে ধরলে দেখবে শিখাটা অন্য দিকে বেঁকে গেছে। ঐ পাতলা পর্দা বাতাসকে চেপে রেখেছে বলেই এমনটি হয়। দেখো শিখাটা যেভাবে বাঁকছে তাতে বোঝা যায় যে চাপটা নেহাত ফ্যালনা নয়।

লোকে যদিও বলে বুদবুদের মতো ক্ষণস্থায়ী, যত্ন নিলে এর ক্ষণস্থায়ী হবার কোনো কারণ নেই। সপ্তার পর সপ্তা একটা বুদবুদকে টিকিয়ে রাখা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইংরেজ পদার্থবিদ ডিউয়ার গ্যাসকে তরলীকরণে তাঁর অবদানের জন্য বিখ্যাত। তিনি সাবানের বুদবুদকে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ ধরনের বোতল তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে ধুলো ঢুকত না, সেখানে বুদবুদ শুকিয়ে যেতে পারত না বা ঝাঁকানি খেতে পারত না। এভাবে তিনি এক মাসেরও উপরে বুদবুদ রেখে দিতে পারতেন। লরেন্স নামক একজন আমেরিকান এক বছরেরও উপর সময় একটা বুদবুদকে টিকিয়ে রেখেছিলেন একটি কাপের মধ্যে।

মনে কোরো না বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী বুদবুদ তৈরি করাটাই সবসময় সবার লক্ষ্য। কঠিন পদার্থের গঠন নিয়ে গবেষণা করার জন্য কিছু বিজ্ঞানী অনেকগুলো ছোট বুদবুদ সৃষ্টি করেছেন সাবানের। বুদবুদগুলো কীভাবে ঘনসংবদ্ধ ও সারিবদ্ধ হয়ে সেজে গেল এবং দু'পাশে কাঠির চাপে তাদের সারিতে কীভাবে নানা গরমিলের সৃষ্টি হচ্ছে এসব তাঁরা খুব ভালো করে লক্ষ করেছেন, ফটো তুলে রেখেছেন। এগুলো থেকে বোঝা গেছে কঠিন পদার্থের কেলাসের মধ্যে সাজানো অণুগুলো কীরকম আচরণ করে। ওদের সজ্জায় কেমন করে ত্রুটির সৃষ্টি হয়, আর সে-ত্রুটি কীরকম গুরুত্ব রাখে! বিজ্ঞান গবেষণায় সাবান-বুদবুদের যে কতরকম ভূমিকা তা জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। অবশ্য তোমাকে আনন্দ দিতেও-বা তার ভূমিকা কম কী? কী বল?

সাধারণ ঘটনার পদার্থবিদ্যা

চকের আর্তনাদ

শিক্ষক বোর্ডের উপর লিখতে গেলেন। বেকায়দায় চক ধরে বোর্ডের উপর আঁক দিতেই বিচ্ছিরি এক আর্তনাদের শব্দ উঠল। এমন কেন হয়?

এক কথায় বলতে গেল ঘটনাটার কারণ হল 'লাগা আর পিছলে যাওয়া'। ভুলভাবে ধরা চক দিয়ে বোর্ডে ঘষা দিলে প্রথমে চকটা বোর্ডের উপর লেগে যেতে চায়। কিন্তু লেখকের ঘষার কারণে পরক্ষণেই এটা পিছলে গিয়ে নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপতে থাকে। এই কাঁপুনির ফলে এটা দ্রুত বারবার বোর্ডের উপর আঘাত করতে থাকে—আর্তনাদের শব্দ এভাবেই সৃষ্টি হয়। কাঁপুনি কমে এলেই চকের সাথে বোর্ডের ঘষা বৃদ্ধি পায় এবং চক আবার বোর্ডে লেগে যেতে চায়।

বেহালার বেহাগ

সেতারের বা গিটারের তারে টোকা দিয়ে তার কাঁপানো হল—শব্দ সৃষ্টির কারণটা এখানে পরিষ্কার। কিন্তু বেহালায়? বেহালায় তারের ওপর আরেকটা আপাত-মসৃণ তার ঘষে গেলেই শব্দ তৈরি হয়। এমন কেন হয়?

ছড়টা টানার সময় এটা একবার বেহালার তারের সাথে লেগে যায়, পরক্ষণেই এটা পিছলে যায়। পিছলে যাওয়ার পর আবার লেগে না যাওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়টুকু তারটি নিজ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপতে থাকে। ছড় টানার সময় এভাবে লেগে যাওয়া আর পিছলে যাওয়া চলতেই থাকে।

কেতলির কোলাহল

চায়ের পানিটা যখন চুলায় চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন বিভিন্ন পর্যায়ে এর শব্দ শুনেই বোঝা যায় কাজ কদ্দুর এগুলো। ফোটা আরম্ভ হবার আগে প্রথমে পাওয়া যায় একটা চাপা হিসহিস শব্দ। এটা ক্রমে বাড়তে থাকে, কিন্তু এ-পর্যায়ে অন্যকিছু কর্কশতর শব্দে এটা চাপা পড়ে যায়। পানি সত্যি সত্যি ফোটা আরম্ভ হবার সময় কিন্তু শব্দ আবার কোমল হয়ে যায়। এমন কেন হয়?

প্রথম হিসহিস শব্দটা আসে ডেকচি বা কেতলির তলাটা গরম হয়ে যেখানে ছোট ছোট বুদবুদের সৃষ্টি হয় সেখান থেকে। এরকম এক-একটা বুদবুদসৃষ্টির শব্দটা হল একটা 'ক্লিক' শব্দের মতো— কিন্তু এদের সম্মিলিত শব্দ হয়ে পড়ে হিসহিসমতো। আরো গরম হলে বুদবুদগুলো তলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপরে উঠে আসে এবং উপরে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পানিতে এসে চুপসে যায়। এর ফলে তৈরি শব্দটা যথেষ্ট কোলাহল সৃষ্টি করে। এই কোলাহল চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো পানি এমন গরম হয়

যাতে বুদবুদগুলো একেবারে পানির উপরে উঠে এসে ফেটে যেতে পারে। এই পর্যায়ে পানি পুরোপুরি ফুটন্ত অবস্থায় আসে। উপরে উঠে এসে বুদবুদ ফাটার শব্দটা কোমলতর, অনেকটা পানিতে কিছু পড়ার টুপটাপ শব্দের মতো।

আঙুল মটমট

টানলে বা বাঁকালে আঙুলের গাঁটে গাঁটে মটকা ওঠে। অনেকের তো কিছুক্ষণ পরপর এই শব্দ তোলা রীতিমতো বদভ্যাসে পরিণত। কিন্তু হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পরপর। একবার করার পর এটা সাথে সাথেই আবার করা যায় না। এমন কেন হয়?

আঙুলের গাঁটগুলো হল হাড়ের সংযোগস্থল। নড়াচড়ার সুবিধার জন্য যন্ত্রের সংযোগের মতো এখানেও একরকম পিচ্ছিলকারী তরল রয়েছে। আঙুল টানলে ওর মধ্য থেকে গ্যাসের খুব ছোট ছোট বুদবুদ উঠে ফেটে যায়। শব্দটা ঐ বুদবুদ ফাটার শব্দ। সাথে সাথে আবার এটা করা যায় না কারণ গ্যাস একবার বেরিয়ে যাবার পর তরলের মধ্যে পুনরায় গ্যাস শোষিত হতে একটু সময়ের প্রয়োজন।

চমকিলা, গরজিলা না

বিজলির চমক দেখলে কিছুক্ষণের মধ্যে তার গর্জন শোনা যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় চমক দেখা যায় কিন্তু গর্জন আর শোনা যায় না। দেখা গেছে যে বিজলির চমকটা ১৫ মাইল দূরে হলে তার শব্দ আর শোনা যায় না। অথচ ১৫ মাইল দূরের কামানের গর্জন দিব্যি শোনা যায়। এমন কেন হয়?

গরম বাতাসে শব্দ দ্রুততর হয়। মাটির অপেক্ষাকৃত কাছের বাতাস উষ্ণ বলে বিজলিতে উৎপন্ন শব্দতরঙ্গের উপরিভাগ নিচের ভাগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধীরে এগোবে। ফলে এর গতিপথ ক্রমে উপরের দিকে বাঁক নেবে। ১৫ মাইলের অধিক দূরত্বে এই বাঁকটা এত বেশি হবে যে এটা পুরোপুরি ওপরের দিকেই যাবে—ফলে মাটির কাছে শব্দ শোনা যায় না।

ছিদ্রান্বেষী কোলাহল

পাশের ঘরে ভীষণ কোলাহল। কিন্তু দরজাটা আটকে দিলে আমি নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু ধরা যাক দরজায় একটুখানি ফাঁক রাখলাম—সামান্য এক চিলতে ফাঁক। তা হলে কোলাহলও ঐ সামান্য একটু আসার কথা আমার ঘরে। কিন্তু না, মনে হল পুরো গোলমালটাই আমার ঘরে শোনা যাচ্ছে ঐ এক চিলতে ফাঁক দিয়ে—যেমনটি শোনা যায় দরজা একেবারে খোলা থাকলে। এমন কেন হয়?

এটা শব্দের অপবর্তনের কারণে হচ্ছে। সরু ফাঁক দিয়ে শব্দতরঙ্গ ঢুকে শুধু ঐ ফাঁক বরাবরই এগোয় না বরং বেঁকে গিয়ে কোনা ঘুরে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পাশের ঘরের পুরো কোলাহল দরজার এক চিলতে ফাঁক দিয়ে এসে এ-ঘরের পুরোটায় ছড়িয়ে পড়ছে।

পেছনে ফিসফিস

আমরা অনেক সময় সন্দিহান থাকি কেউ মুখ ঘুরিয়ে ফিসফিস করে বিরুদ্ধে কিছু বলছে কি না। সন্দিহান হবার কারণ আছে বইকী! সাধারণ কথা, তা নিম্নস্বরেও যদি বলা হয়, আমাদের সামনে পেছনে যেদিকে ফিরেই বলা হোক-না কেন আমরা শুনতে পাই। কিন্তু ফিসফিস করে বলা কথা অনুরূপ জোরে বললেও তা সামনাসামনি না বললে শোনা মুশকিল। এমন কেন হয়?

কেউ যখন পেছন ফিরে স্বাভাবিক গলায় কথা বলে তখন তার কথা আমরা শুনতে পাই কারণ শব্দ অপবর্তনের ফলে তার মাথার দু'পাশ দিয়ে বেঁকে পেছনেও আসে। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বা পর্যাবৃত্তিহার যত কম হবে ততই এটা বেশি সম্ভব হবে। কারণ, নিম্নতর ফ্রিকোয়েন্সি অর্থাৎ উচ্চতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য অপবর্তনের কৌণিক প্রশস্ততা অধিক। ফিসফিস করে বলা শব্দের বৈশিষ্ট্য হল এতে প্রধানত উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সিগুলোই থাকে— নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সিগুলো নয়। এরকম শব্দের অপবর্তন কম ঘটে বলে এদের বক্তার মাথা ঘুরে পেছনে আসার সম্ভাবনা কম।

পানির কলে তুফান

পানির কল খুললাম, হঠাৎ করে মনে হল তর্জন-গর্জন শুরু হয়ে গেল। সবসময় এটা হচ্ছে না, কল খানিকটা ঘুরিয়ে দিলে এটা তো চলে যাচ্ছে। এমন কেন হয়?

পানির কলের সীমিত ফাঁক দিয়ে বেশি পানির চালান করা হলে ওতে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয় এবং ফলে এর মধ্যে বুদবুদ দেখা দেয়। এই বুদবুদের কাঁপুনি থেকেই তর্জন-গর্জন। পানির নল, আর যেই দেয়াল, ছাদ বা মেঝের সাথে এটা লাগানো ওদের সাথে অনুনাদের কারণে শব্দ যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে।

টাং টাং ফিস ফিস

শুনলেই বোঝা যায় কোনটা পুরুষের স্বর ও কোনটা মহিলার স্বর। আবার সাধারণ কথা থেকে আমরা ইচ্ছে করলেই ফিসফিস করে কথা বলা শুরু করতে পারি। এমন কেন হয়?

স্বরতন্ত্রীগুলোর দৈর্ঘ্য এবং টান দিয়েই নির্ধারিত হয় গলার স্বরের তীক্ষ্ণতা। কণ্ঠনালির বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পেলে স্বরতন্ত্রীগুলো হঠাৎ করে ফাঁক হয়ে গিয়ে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এর ফলে স্বরতন্ত্রীগুলো ক্রমাগত কাঁপতে থাকলে সেই কাঁপুনিই বাতাসে কাঁপুনি সৃষ্টি করে মুখগহ্বর এবং নাসিকাগহ্বরের অনুনাদী ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে উত্তেজিত করে। পুরুষের গলার স্বর অপেক্ষাকৃত কম তীক্ষ্ণ হবার কারণ মহিলাদের তুলনায় তাদের স্বরতন্ত্রী মোটা এবং লম্বা— যার ফলে এরা নিম্নতর ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদেরও স্বর মহিলাদের অনুরূপ, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে এই বেঁটে ও সরু স্বরতন্ত্রী বয়স্ক পুরুষের অনুরূপ হয়ে পড়ে। ফলে স্বরও হঠাৎ করে ভারী হয়।

ফিসফিস করে কথা বলার সময় স্বরতন্ত্রীগুলো ঢিলে করে সরিয়ে রাখা হয়। শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি তখন নির্ভর করে বাতাসের গতিপথে অন্যান্য সব বাধার কম্পনের দ্বারা এবং মুখ ও নাসিকাগহ্বরের অনুনাদী ফ্রিকোয়েন্সির দ্বারা।

গোসলখানায় গান

নেহাত অগায়ক অভাজনও গোসলখানায় ঢুকলে তার মুখে গলাখোলা গান আসে। এটা শুধু নির্জনতার সুযোগগ্রহণ নয়, বরং সেই গান গায়কের কাছে যথেষ্ট সমৃদ্ধ সঙ্গীত বলে মনে হয় এবং বেশ একটু আত্মসন্তুষ্টি পাওয়া যায়। এমন কেন হয়?

বড় খোলামেলা জায়গায় গান গাইলে গানের শব্দ যেটুকু তৈরি হয় ঐটুকুই শোনা যায়। কিন্তু গোসলখানার মতো ছোট বদ্ধ জায়গায় প্রতিটি শব্দ বহুবার প্রতিফলিত হয়ে আসে। ফলে শব্দের রেশটি দীর্ঘায়িত হয়। এর ফলে গানের 'চাকচিক্য' এবং 'সম্পূর্ণতা' বাড়ে। উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দাংশগুলোর রেশ চলতে থাকাই গানের ব্রিলিয়ান্স বা চাকচিক্য, আর নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির (নিচু খাদের) শব্দাংশগুলোর রেশ থাকাটা গানকে ভরাট করে বা এর 'পূর্ণতা' বাড়ায়।

বেইমান ক্যাসেট

আমাদের অনেকের দীর্ঘদিনের ধারণা নিজের গলার স্বরটি সুন্দর ভরাট, নিটোল। একদিন শখ করে তাই ক্যাসেটে গলাটি রেকর্ড করে শুনি। আর সেদিনই ঘটে স্বপ্নভঙ্গ। এ কার গলা শুনছি? নিজের যে-গলা এত বছর ধরে শুনছি তার বদলে একী চিকনমতো স্বর? অথচ একই সঙ্গে বন্ধুটিও রেকর্ড করল। তার গলার স্বর এমনিতে যেমন শুনি, রেকর্ডেও তা-ই শুনছি। আমার বেলায় শুধু ক্যাসেটের বেইমানি। এমন কেন হয়?

নিজের গলার স্বর যখন আমরা সরাসরি নিজে শুনি তখন তার অনেকখানিই আমাদের কানে আসে মুখমণ্ডলের হাড়সমূহের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে। বিশেষ করে শব্দের নিম্নতর ফ্রিকোয়েন্সিগুলো। এভাবে স্বর নিজকানে ভালোভাবে বাহিত হবার সুযোগ পায়। এর ফলে নিজের কাছে নিজের স্বর অনেকখানি ভরাট মনে হয়, কিন্তু অন্যে যখন সেই স্বর শোনে তখন শুধু বাতাসের মধ্য দিয়েই তা শোনার সুযোগ পায় এবং তাতে ঐ নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সিগুলো কিছু বাদ গিয়ে স্বর আর অত ভরাট থাকে না। ক্যাসেটও রেকর্ড করার সময় এই কম ভরাট, অন্যের শোনামতো স্বরই রেকর্ড করে, নিজের শোনামতো নয়। তাই এই স্বপ্নভঙ্গ।

চিমনির চারপাশে

চুলার উপরে চিমনি বসালে চুলার ধোঁয়া রান্নাঘরে ছড়ানো বন্ধ হয়। চিমনির ছিদ্রটা যদি চুলার ঠিক উপরে নেয়া না-ও হয় তবুও কিন্তু ধোঁয়া চিমনি দিয়েই যায়। কেন এমন হয়?

চুলায় গরম হওয়া বাতাস আর ধোঁয়া ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা বলে ঐ ঠাণ্ডা বাতাস একে টেনে উপরের দিকে ওঠাবে। একবার এই বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়া শুরু হলে চিমনি হুবহু উপরে না থাকলেও এটা চলতে থাকবে।

দিনের ক্যাম্প-ফায়ার

শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে গানবাজনা করে স্কাউটের দল, এটাই ক্যাম্প-ফায়ার। কিন্তু অনুষ্ঠানটি যদি দিনের বেলায় হত আর এমনি আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্প-ফায়ার করা হত সেটা খুব সুখপ্রদ ব্যাপার হত না। কেন এমন হয়?

আগুনের চারপাশের বাতাস রাতে ঠাণ্ডা থাকে বলে চিমনির ধোঁয়ার মতো এই আগুনের ধোঁয়াকে ঠাণ্ডা বাতাস ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দেয়। দিনের বেলায় চারপাশের বাতাস অত ঠাণ্ডা হবে না বলে ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে সবার নাকে-মুখে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

ঢাকনির সাহায্যে

ডেগচির পানিতে যখন চাল ফোটাচ্ছেন, তখন ঢাকনিটা দিয়ে ঢেকে দিলে পানি তাড়াতাড়ি ফুটবে—এ-খবর আপনার জানা আছে। কিন্তু কেন তাড়াতাড়ি ফুটবে? তাপের অপচয় কমে বলে? অর্থাৎ পরিচলন বা বিকিরণের মাধ্যমে কিছু তাপ খোলা ডেগচি থেকে বেরিয়ে যায় বলে? কিন্তু ঢাকনিটাও তো প্রায় ফুটন্ত পানির সমান উত্তপ্ত থাকে। সেটা থেকেও তো তাপ ওভাবে চলে যাবে। তবুও ঢাকনি দেয়া ডেগচির পানি দ্রুত ফুটানো সম্ভব। কেন এমন হয়?

পানি ফুটাবার সময় তাপের একটা বড় অংশই খরচ হয় খানিকটা পানিকে বাষ্পে পরিণত করাতে। খোলা ডেগচিতে এই বাষ্প বের হয়ে যেতে পারে সেই তাপটুকু সাথে নিয়ে। ঢাকনি একে ভিতরে রেখে দেয়।

এভারেস্ট কেন সর্বোচ্চ?

পৃথিবীতে কোনো পর্বতের এভারেস্টের চেয়ে খুব বেশি উঁচু (যেমন এর কয়েক গুণ) হবার সম্ভাবনা নেই। আসলে ত্রিশ কিলোমিটার হচ্ছে পৃথিবীর পর্বতের সর্বোচ্চ উচ্চতার সীমা। কেন এমন হয়?

এর বেশি উঁচু হলে নিজের ওজনের দাপে পর্বতের ভিত্তি তরলায়িত হয়ে পর্বতটি খানিকটা বসে যাবে। ফলে ঐ বাড়তি উচ্চতাটুকু আর থাকবে না।

হিমালয়ে হাওয়া-বদল

ব্রিটিশ আমলে গরমে অস্থির হলে সাহেবসুবোরা গিয়েছেন সিমলা, কি দার্জিলিং। পাকিস্তান আমলেও কেউ-কেউ যেতেন মারি হিল। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় ঠাণ্ডা হবার তো কোনো কথা ছিল না! সূর্যিমামার কিরণের অংশ উঁচু জায়গা তো নিচু জায়গার চেয়ে কম পায় না। তা ছাড়া ঠাণ্ডা বাতাস ভারী বলে তা তো নিচের দিকেই জমার কথা বেশি। কিন্তু তবু উঁচু জায়গা ঠাণ্ডা। এমন কেন হয়?

বাতাস যখন পাহাড়ের উপর ওঠে তখন তা অপেক্ষাকৃত কম বায়ুচাপের জায়গাতে গিয়ে পড়ে। চাপ কম বলে বায়ু সেখানে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রসারিত হওয়াতে তার উত্তাপ কমে যায়, যেমন করে কমে যায় রেফ্রিজারেটারের গ্যাস প্রসারিত হলে।

জ্বরকাঠির ভাঙাগড়া

জ্বরের সময় থার্মোমিটার গায়ে দিলে পারা ওঠে। নিয়ে নিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পারা নেমে যেতে পারে না। কারণ নলের এক জায়গায় একটু চাপা থাকে, ঝাঁকি না দিলে যার মধ্য দিয়ে পারা নামতে পারে না। কিন্তু ঐ একই চাপা জায়গা ওঠার সময় দিব্যি পার হয়ে গেছে পারা। কেন এমন হয়?

চাপের মুখে পারা ঐ সরু জায়গা পার হতে পারে। ঝাঁকি দিয়ে যেমন এই চাপ দেয়া যায়, উত্তাপে প্রসারিত হলেও এমনি চাপ পড়ে। কিন্তু সংকুচিত হবার সময় নিচের পারাস্তম্ভ উপরেরটুকুকে সুদ্ধ টেনে আনতে পারে না, কারণ এর আন্ত-অনু বলের অত জোর নেই।

গরম চা পরিবেশন-নীতি

চায়ের রং তৈরি। কিন্তু মেহমানের চায়ের টেবিলে বসতে মিনিট পাঁচেক বাকি। আপনি একেবারে গরম চা তাদের সামনে দিতে চান। দুধ-চিনি এখনই মেশাবেন, না দেয়ার ঠিক আগে মেশাবেন? সিদ্ধান্তটি যা-ই হোক, কেন এমন হয়?

দুধ পরিবেশনের ঠিক আগে মেশাবেন, কারণ দুধ চা'কে ঠাণ্ডা করবে। চিনিও তা-ই করবে, কারণ চিনি গলাতে শক্তি ব্যয় হয়, ঐ শক্তিটুকু চায়ের তাপ থেকেই চলে যায়। কোনো অবস্থাতেই ধাতুর চামচ কাপের ভেতর দিয়ে রাখবেন না। এটা নিজে গরম হয়ে আর তাপ পরিবহণ করে অনেকখানি তাপ নিয়ে নেবে।

ফটফট বোটের রহস্য

খেলনাটি রাস্তার পাশে ফেরিওয়ালাদেরই বিক্রি করতে দেখা যায় বেশি। একটি বালতির পানির মধ্যে চলছে টিনের তৈরি খেলনা-বোট— ফটফট শব্দ করতে করতে। ভেতরে কেরোসিনের ছোট্ট একটা কুপি জ্বালানো, তার উপর পানির ছোট্ট বয়লার—দুটা নল বালতির পানিতে বের হয়ে আসা। বয়লারে পানি বাষ্প হলে নলের পানি ধাক্কা খেয়ে সজোরে জেটের মতো বেরিয়ে আসলে বোট সামনে যায়। কিন্তু বয়লারের পানি ফুরিয়ে গেল নল দিয়ে আরো পানি গিয়ে ভেতরে ঢোকে। এই ঢোকার সময় তো বোটের পেছনের দিকে চলার কথা, বেরোবার সময় সামনের দিকে যতখানি গিয়েছিল। কাজেই মোটের উপর বোটের এগোবার কথা নয়, তবুও কিন্তু এটা এগোয়। কেন এমন হয়?

বয়লারের কিছু বাষ্প অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা নলে জমে সংকুচিত হয় ফলে বাইরে থেকে পানি এসে নলে ও বয়লারে ঢোকে। কিন্তু ঢোকার সময় সব পানি সরাসরি বিপরীত দিক থেকে আসে না বরং বিভিন্ন দিক থেকে তেরচা হয়েও আসে। বেরোবার সময় কিন্তু পানির পুরো জেট সোজা পেছনের দিকে, একই দিকে যায়। কাজেই ঢোকা আর বেরোবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অপ্রতিসাম্য রয়ে গেছে। বোট সামনের দিকে এগোতে যতখানি সংহত শক্তি পায়, পেছনের দিকে যেতে ততখানি নয়। এই পার্থক্যটুকুই বোটকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শহর নামের তাপ-দ্বীপ

শহরের উষ্ণতা তার চারপাশের গ্রামগুলোর চেয়ে ৫ থেকে ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত বেশি হতে পারে। বলা যায় গ্রামবাংলার স্বাভাবিক উষ্ণতার মাঝে বড় শহরগুলো যেন দু'একটা তাপ-দ্বীপের মতো। এমন কেন হয়?

শহরের উষ্ণতা বেশি হবার কয়েকটি কারণ রয়েছে। শহরে পানির বাষ্পীভবন কম হয়। পানির খোলা উৎস তো কম বটেই, গাছের পাতা থেকে যে বিপুল পরিমাণ পানি বাষ্পীভূত হয় তাও গ্রামের চেয়ে এখানে অনেক কম। এরকম বাষ্পীভবনের ফলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়, যার সুযোগ শহরে কম। বায়ুপ্রবাহের সুযোগও শহরের উঁচু জটিল অবয়বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

কর্ষণের আরেক গুণ

কর্ষিত মাটির উপর একটা পায়ের ছাপকে যদি না নেড়ে রেখে দেয়া যায়, তা হলে দেখা যায় যে পায়ের ছাপের ঠিক তলায় মাটি শক্ত ও শুকনা হয়ে আছে। শুকনা আবহাওয়ায় শুকনা মাটিতে যেটুকু আর্দ্রতা আছে তা ধরে রাখার জন্য বারবার চাপ দেয়া হয়। অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মাটি কর্ষণ করে নেড়েচেড়ে দিলেই শুকাবে তাড়াতাড়ি, আর পায়ের ছাপের তলায় চেপে দেয়া মাটিই ভেজা থাকবে বেশি। এমন কেন হয়?

পায়ের ছাপের তলায় চেপে শক্ত হওয়া মাটিতে অসংখ্য খুব সরু সরু ছিদ্রপথ থাকে। এরকম সরু নলাকৃতি পথ কৈশিক নলের মতো কাজ করে এবং কৈশিকতার নিয়মে এদের মধ্য দিয়ে ভেতরের পানি উপরে উঠে আসে, যেমনভাবে সরু নল ডোবালে গ্লাসের শরবত উঠে আসে। অকর্ষিত শক্ত মাটির ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। পানি এভাবে ক্রমে উপরে উঠে আসে এবং বাষ্পীভূত হতে থাকে। অকর্ষিত মাটি তাই দ্রুত আর্দ্রতা হারায়। অপরদিকে মাটির উপরিভাগের খানিকটা কর্ষণ করে নেড়েচেড়ে দিলে এতে বড় বড় ফাঁক দেখা দেয় যার মধ্যে কৈশিকতার সম্ভাবনা কমে যায়। তাই কর্ষিত মাটি ভেতরের আর্দ্রতা রক্ষা করে।

নোনা-ধরা দেয়াল

পাকা দেয়ালে প্রায়ই মাটি থেকে পানি উঠে নোনা ধরতে দেখা যায়। এটা বন্ধ করবার একটা মজার উপায় হল একটা ইলেকট্রিকের তারের সাহায্যে ঐ দেয়ালকে আর মাটিতে গেড়ে রাখা ধাতুর একটা দণ্ডকে সংযোগ করে দেয়া, অনেকটা ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আর্থ করার মতো করে। এভাবে সংযুক্ত দেয়ালে পানি ওঠা ও নোনা ধরার সম্ভাবনা কমে যায়। এমন কেন হয়?

কৈশিকতার কারণে মাটি থেকে পানি চুইয়ে দেয়ালের মধ্যে খানিকটা পর্যন্ত ওঠে। সেখানে পানি শুকানোর ফলে পানির সাথে মেশানো লবণজাতীয় জিনিসগুলো জমতে থাকে। এই লবণের অসমোটিক চাপের (যার মাধ্যমে ঘন দ্রবণের দিকে হালকা দ্রবণ থেকে পানি যায়) ফলে পানি দেয়ালের আরো উপর দিকে উঠতে থাকে। লবণের ধনাত্মক আয়নগুলো বৈদ্যুতিক ভূ-সংযোগের ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে অসমোটিক চাপটি দূর করে দেয়।

নিভিবার পূর্বে

প্রদীপ নিভবার পূর্বে দপ করে জ্বলে ওঠে—একথা আমরা নানা উপমায় ব্যবহার করি। কিন্তু ঐ মূল ঘটনাটি এমন কেন হয়?

নেভার আগে সলতের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাতে শিখা যদি একটু বড় হয় তা হলে ঐ শিখা বজায় রাখার মতো পরিমাণে জ্বালানির যোগান সলতের কৈশিকতার মাধ্যমে দেয়া সম্ভব হয় না। শিখা তাই ছোট হয়ে যায়। কিন্তু তখন আবার শিখার খরচের চেয়ে বেশি জ্বালানি চলে যায় বলে জ্বালানি জমে গিয়ে শিখা আবার দপ করে জ্বলে ওঠে। এভাবে নেভার আগে কয়েকবার কমে গিয়ে আবার দপ করে জ্বলে ওঠে।

উঃ, কী ঠাণ্ডা !

ঘরের মাঝখানে একটুকরা কার্পেট। চারধারে সিমেন্টের খালি মেঝে। খালিপায়ে কার্পেটের উপর দিব্যি আরামে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সিমেন্টের মেঝেতে পা দিতেই বলে উঠলেন, উঃ কী ঠাণ্ডা! একই ঘরের কার্পেট ও সিমেন্ট উভয়ে একই উত্তাপে থাকার কথা। তবু একটাকে উষ্ণ, আরেকটাকে ঠাণ্ডা বলছেন। এমন কেন হয়?

আসলে ঠাণ্ডা লাগা আর ঠাণ্ডা হওয়া সবসময় এক জিনিস নয়। ঘরের সিমেন্ট কার্পেটের চেয়ে মোটেও বেশি ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু যেহেতু সিমেন্টের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা কার্পেটের চেয়ে বেশি, সুতরাং সিমেন্টের মধ্য দিয়ে আপনার পায়ের তলার তাপ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে, কাছেই আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।

কড়াইয়ের বড়াই

এই অ্যালুমিনিয়াম আর স্টেনলেস স্টিলের যুগেও কিছু প্রাচীন ধাঁচের গিন্নি আছেন যাঁরা কিছুতেই তাঁদের ভারী লোহার কড়াইটা আর তাওয়াটা ছাড়বেন না। তাঁরা দাবি করেন, এতে সব দিকে সমানভাবে সুন্দর রান্না হয়, পাত্রের গায়ে খাবার লেগে যাওয়ার ভয়ও কম। কথাটা সত্যি হলে, এমন কেন হয়?

কাঁচা লোহার পাত্রগুলো আধুনিক পাতলা স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি মোটা ও ভারী। ফলে এরা আগাগোড়া সমানভাবে গরম হয়। অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিলের পাতলা পাতের তলায় ঠিক যেখানে আগুন সেখানটিতেই গরম হয় বেশি। এমনি 'গরম জায়গার' উপস্থিতিই পাত্রের গায়ে খাবার লেগে যাবার জন্য দায়ী। লোহার কড়াইতে এর সম্ভাবনা কম।

দুধের রং

এক গ্লাস পানিতে দু'এক ফোঁটা দুধ মেশানো হল। এবার গ্লাসের ভেতর দিয়ে একটি সাদা আলোর উৎসের দিকে (যেমন ইলেকট্রিক বাতি) তাকালে তাকে লাল অথবা হালকা কমলা রঙের দেখাবে। আবার গ্লাস থেকে প্রতিফলিত আলোর দিকে তাকালে নীল দেখা যাবে। এমন কেন হয়?

খুব সূক্ষ্ম কণিকার দ্বারা আলোর বিসরণের ফলে এটা হয়, দৃশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণিকা। এক্ষেত্রে দুধের ভাসমান কণাগুলো এ-কাজ করছে। বিসরণের তত্ত্ব অনুসারে স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল আলো লাল বা কমলার তুলনায় অধিক বিসরিত হবে। ফরে সরাসরি গ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকালে তাতে নীলের ঘাটতি ও লালের আধিক্য থাকবে। বিসরিত আলোতে অবশ্য নীল বেশি থাকবে। আকাশ তো এই একই কারণে নীল দেখায়। সেক্ষেত্রে কণিকাগুলো কী?

ভাসমান প্যাটার্ন

মাঝে মাঝে আমরা চোখের সামনে নানারকম বৃত্তাকার, রিং-আকৃতির প্যাটার্ন ভেসে বেড়াতে দেখি। এরা হালকা রঙের, খুব একটা স্পষ্টও নয়। এমন কেন হয় ?

চোখের রেটিনার সামনে গোলাকার দু'একটি রক্তকণিকা ভেসে বেড়ায়। এদের মধ্য দিয়ে আসার সময় আলোর ডিফ্রাকশনের ফলে ঐ সব ভাসমান প্যাটার্ন দেখা যায়।

মিটমিট তারা

তারাগুলো মিটমিট করতে আমরা দেখি। আসলে তো আর তারার আলো এরকম জ্বলে নেভে না। এমন কেন হয় ?

তারা মিটমিট করার কারণ তারার মধ্যে নয়, সেটা আমাদের বায়ুমণ্ডলে। বায়ুমণ্ডলে তাপ বণ্টনে তারতম্যের জন্য ছোট ছোট ঘূর্ণি এর মধ্যে সর্বত্র বিরাজ করছে। এদের মধ্য দিয়ে তারার আলো আসার সময় তা একবার এদিকে, আবার পরক্ষণে অন্যদিকে প্রতিসরিত হতে থাকে। পৃথিবী থেকে দেখা তারার ছোট অবয়বে এই নড়াচড়া যত দেখা যায়, চাঁদ বা গ্রহের মতো অপেক্ষাকৃত বড়-দেখা জিনিসের ক্ষেত্রে তা হয় না। তাই তারাই শুধু মিটমিট করে, অন্যরা নয়।

রং-জ্বলা কাপড়, ছবি

রোদে কাপড়ের রং জ্বলে যায়। রোদে রাখলে, এমনকি সাদা ফ্লোরেসেন্ট বাতির আলোতে রাখলে ছবির রং-ও জ্বলে যায়। এমন কেন হয়?

রং জ্বলে যাওয়ার জন্য দায়ী হল আলট্রাভায়োলেট আলো। কাপড়ের বা ছবির রং বস্তুর জৈব পদার্থগুলো এই আলো শোষণ করে, যার ফলে এদের আণবিক বন্ধনগুলোর পরিবর্তনের ফলে রঙের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক বড় বড় মিউজিয়ামগুলোতে রাখা চিত্রকর্মগুলোর ধীরগতিতে রঙের অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ফ্লোরেসেন্ট বাতির আলট্রাভায়োলেট আলোই এর জন্য দায়ী। এখন মিউজিয়ামে হয় আলট্রাভায়োলেট ফিল্টার ব্যবহার করা হচ্ছে, নইলে সেই পুরানো সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির বাল্‌বে ফিরে যাওয়া হচ্ছে।

চোখের পানিতে ঝাপসা

অঝোর কান্নায় চোখ ভাসিয়ে দিলে আশপাশে কোথায় কী হচ্ছে দেখা মুশকিল হয়। এমনি অসুবিধায় পড়েন সাঁতারুরা ডুব-সাঁতার দেয়ার সময়—বিশেষ কিছু তাঁরা দেখতে পান না। অথচ ডুবুরির চশমা পরে নিলে অনেক ভালো দেখতে পাওয়া যায়। এমন কেন হয়?

চোখের রেটিনায় স্পষ্ট ছাপ পড়ার জন্য আলোকে চোখের মধ্যে প্রতিসরিত হতে হয়। এই প্রতিসরণের তিন ভাগের দুভাগই ঘটে চোখের বাইরের তলে। এই তলের সাথে পানি থাকলে প্রতিসরণ আর হয়ে ওঠে না, কারণ পানির প্রতিসরনাঙ্ক আর চোখ যে-বস্তুতে তৈরি তার প্রতিসরনাঙ্ক প্রায় এক। ডুবুরির চশমা ব্যবহার করলে চোখের সামনে বাতাস থাকে বলে স্বাভাবিকভাবে দেখা সম্ভব হয়।

সাইকেল সাবধান

রাতের বেলায় নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য সাইকেলের পেছনে লাল প্রতিফলক লাগানো হয়। এর উপর যে-কোনো আলো এসে পড়লে এটা জ্বলজ্বল করে, অর্থাৎ সে-আলো প্রতিফলিত হয়ে আলোক-উৎসের কাছে ফেরত যায়। এটা যদি সাধারণ আয়না হত তা হলে শুধু লম্বভাবে আসা আলোই উৎসের কাছে ফেরত যেত। অন্যদিক থেকে আসা আলো কোণ করে ভিন্ন দিকে যেত। তা হলে এই প্রতিফলকে এমন কেন হয় ?

এতে গোলক বা ত্রিশিরা প্রিজমের আকারে প্রতিফলক থাকে বলে আলো যেদিক থেকেই আসুক উৎসে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য বরাবর উৎসে গেলে এটা কাজে আসবে না, কারণ চোখ তো আর ঠিক উৎসে নেই। সাইকেলের প্রতিফলক অতটা নির্ভুল নয় বলেই এর প্রতিফিলত আলো চোখে যেতে পারে।

পানি দিয়ে পোড়ানো

গাছের পাতায় দিনের বেলায় পানি ছিটিয়ে না দেয়াই ভালো। কারণ এরকম পানি ছিটালে পাতার উপর বাদামি দাগ পড়তে দেখা যায়। কেন এমন হয়?

গাছের পাতায় দেয়া পানি ফোঁটার আকারে জমলে তা অনেক সময় আতশি কাচের রূপ নেয়। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে পাতার ঐ অংশ পুড়িয়ে দিতে পারে।

আঁধারে বিড়ালের চোখে

আঁধারে টর্চের আলো ফেললে বিড়ালের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। এমন কেন হয়?

বিড়ালের চোখ অনেকটা সাইকেলের পেছনের প্রতিফলকের মতো। এতে এমন লেন্স ও বাঁকা আয়না থাকে যে আলো যে-কোনো দিক থেকে এসে প্রতিফলিত হয়ে উৎসে ফিরে যায়। সাধারণ দিনের আলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার পরিবেশে এটা লক্ষ করা যায় বেশি। অনেক পশুরই এইরকম চোখ আছে।

পোলারয়েড চশমা

আজকাল রঙিন চশমা হিসাবে যে পোলারয়েড চমশার চল বেশি সেগুলো চোখে আলোর ধাঁধা লাগানোটা কমিয়ে ফেলে অথচ মোট আলো সেভাবে কমায় না। এমন চশমা ব্যবহার করে মাছ ধরার সময় পানির নিচে মাছ দেখতেও সুবিধা হয়। এমন কেন হয়?

সূর্যের সরাসরি আলো পোলারিত নয় অর্থাৎ এর আলোকতরঙ্গের কম্পন সব দিকে এলোমেলো। ঠিকমতো ঠিক কোণ করে প্রতিফলিত হয়ে এলে এর বেশ খানিকটা পোলারিত হয়ে একই দিকে কম্পনের প্রবণতা দেখা দেয়, যেমন : কোনো-এক অপরাহ্নে সূর্যের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে প্রতিফলিত আলো রাস্তার সমতলের দিকে যথেষ্ট পোলারিত। খাড়া পোলারিত পোলারয়েড ব্যবহার করলে এই ধাঁধা লাগানো প্রতিফলিত আলো তাই চোখে যেতে পারে না ; অন্য আলো অবশ্য বিশেষ কমে না।

সাধারণ সূর্যের আলোতে সব দিকের আলো মেশানো থাকলেও পানির উপরিভাগ থেকে প্রতিফলিত আলো এর সমতলে পোলারিত হয়। ফলে পানির ভেতরে যে-আলো ঢুকল তাতে খাড়া পোলারিত আলো বেশি থাকে। পানিতে প্রতিফলিত আলো ঢুকতে না দিয়ে এবং মাছ থেকে আসা আলো ঢুকতে দিয়ে পোলারয়েড পানির ভেতরে মাছ দেখার সুবিধা করে দেয়। মাছ পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি গভীরে থাকলে অবশ্য এটা খাটে না।

বাঁ-হাতি

আমার ছোট্ট ছেলে উজল বেশ বড় হয়ে উঠেছে, তার বয়স এখন সাড়ে পাঁচ। ওর সবকিছুই আমাদের মতো, শুধু একটি বিষয় ছাড়া। সে বাঁ-হাতি। সে যখন খুব ছোট তখন থেকেই আমরা জানতাম সে বাঁ-হাতি। কারণ বাঁহাতে সে জিনিসপত্র তুলত, বাঁপায়ে বলে লাথি মারত, কাগজে আঁকিবুকিও করত বাঁহাতে। আমরা জানতাম এটি তার জন্মগত গুণ, একে বদলাবার চেষ্টা করলে বদলাতে সে হয়তো পারত ; কিন্তু সেটি জবরদস্তি হত। হাত-পায়ের ব্যবহারে একটি আড়ষ্টতা তার থেকে যেত। তাই ডান-হাতিদের জগতে তাকে আমরা বাঁ-হাতি হয়েই গড়ে উঠতে দিয়েছি।

ছোটবেলায় একটি লেখা পড়েছিলাম—অমল দাশগুপ্তের ন্যাটাতত্ত্ব। সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কোন কোন বাচ্চা কেন ন্যাটা অর্থাৎ বাঁ-হাতি হয়ে ওঠে। পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন বুঝিনি এ-সম্বন্ধে একদিন আরো সরাসরি ভাবতে হবে। আমরা ডানহাতে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বেশি বোধ করব, না বাম হাতে, তা নির্ভর করে মস্তিষ্কের একটি নিয়ন্ত্রক অংশের অবস্থানের উপর। ওটি যদি মস্তিষ্কের বাম দিকে থাকে তা হলে আমরা হব ডানহাতি। অধিকাংশ মানুষেরই তা-ই থাকে। কিন্তু শতকরা গড়পড়তা কয়েকজনের জন্য এই নিয়ন্ত্রক থাকে ডান পাশে, তাই তারা হয় বাঁ-হাতি। ব্যাপারটি জন্মগত।

উজল এখন স্কুলে যাচ্ছে, কিছু-কিছু লিখছে। তাকে যখন লেখা শেখাতে যাই বা তা শোধরাতে চাই তখন আমাকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে সে বাঁ-হাতি। এটি যদি মনে না রাখি তা হলে অনেক সময় আমার দেখানোর ভুলের জন্যই সে উলটা ক বা উলটা B লিখে বসে। আয়নায় ক বা Bকে দেখতে যেরকম হবে সেই আরশি-লিপির মতো। এ ধরনের গোলেমালে প্রায়ই দেখি সে কাগজের ডান দিক থেকে বাম দিকে লিখে যাচ্ছে বেশ তরতর করে । তার নামটিই সে অনেক সময় লিখে ফেলে উজল এর পরিবর্তে লজউ।

এখন বুঝি, ব্যাপারটি ঘটেছে আমরা সব ডান-হাতি মাস্টারদের ভেতরে সে পড়ে গেছে এক বাঁ-হাতি ছাত্র। তাই শুরুতে তার এই অসুবিধা। আমরা বাংলা বা ইংরেজি লিখি শরীরের দিক থেকে ক্রমে বাইরের দিকে। উজলকে লিখতে হয় বাইরের দিক থেকে শরীরের দিকে। তার জন্য এটি আরবি লেখার মতো। দুই পক্ষের বোঝাবুঝিটা হবার পর উজল এখন ওরকম ভুল কম করে।

তবে খেলাধুলায় লক্ষ করি বাঁ-হাতি হবার জন্য উজল বেশ সুবিধা পায়। সামনাসামনি বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করার সময় সে বাঁ পায়ে যা করে তার সামনের ডান-হাতি প্রতিপক্ষ সেটি ঠাহর দিতে পারে না। তার ভাই যখন টেনিস বলটি ছুড়ে দিয়ে বল করে, ন্যাটা ব্যাটসম্যান উজল তখন দিব্যি সেটি হাঁকাতে পারে যেদিকে কেউ আশা করে না সেদিকে।

আজকাল আমি আমাদের ডান-হাতি জগতে এই বাঁ-হাতি ছেলেটির সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিয়ে খুব ভাবি। বাসায়, স্কুলে, অফিসে, যেখানে যাই ছোটখাটো খুঁটিনাটিগুলো খেয়াল করি—দেখি অনেকগুলোই তৈরি হয়েছে আমাদের ডান-হাতিদের কথা মনে রেখে। অবশ্য দু'এক ব্যাপারে বাঁ-হাতিদেরও সুবিধা হয়ে যায় প্রকারান্তে।

রান্নাঘরে গেলে লক্ষ করি এই সাধারণ আলু ছোলার আঁকশিটা, এটি তো বাঁ-হাতে ব্যবহার করা চলবে না। এমনকি ছুরিটাতেও যেদিকে ধার দেয়া আছে তাতে বাঁ-হাতির অসুবিধা। ফ্রিজের দরজার হাতলটা ডান হাতে খোলার উপযোগী করেই তৈরি। এতে অবশ্য বাঁ-হাতির সুবিধাই হয়। কারণ সে একে ডান হাতে খুললে বাঁ হাত দিয়ে স্বচ্ছন্দে এর ভেতর রাখা-নেয়ার কাজটি করতে পারে। টিনের খাবারের টিন খোলার জন্য যে ক্যান-ওপেনার সেটি কিন্তু বাঁ হাতে ব্যবহারের যো নেই। খাবার টেবিলে একটি বিপত্তি লক্ষ করি। উজল যখন তার ভাইয়ের ডানে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে খেতে বসে, তার বাম হাত আর ভাইয়ের ডান হাত উভয়ে খাবার প্রক্রিয়ায় নড়াচড়া করে বলে ঠোকাঠুকি লেগে যায়—সেই থেকে ঝগড়া। অথচ তারা সরেও বসবে না, উজলও ভাইয়ের বামে বসবে না। উজলের একটি কাগজকাটা কাঁচি আছে। কিন্তু কাঁচিমাত্রই এমনভাবে তৈরি যে উজল সেটি বাঁ হাতে সহজে ব্যবহার করতে পারে না। বাচ্চাদের জন্য যে ক্যামেরাটি কিনেছিলাম তার ব্যবহারও উজলের জন্য অসুবিধাজনক— কারণ তার শাটার বোতামটি ডান দিকে।

কাপড় ইস্তিরি করার সময় ভাবি যে বাঁ-হাতির পক্ষে এটি অসুবিধাজনক হবে। কারণ বাঁ হাতে ইস্তিরি ধরলে এর কর্ডটি মাঝখানে এসে বিরক্ত করবে। কাঁটাওয়ালা ঘড়িতে বা ডিজিট্যালে বাঁ হাতে সময় ঠিক করতে ফের ঘড়ি উলটিয়ে নিতে হয়, কারণ কাজ করতে হয় ঘড়ির ডান পাশে। এতে বেশ অসুবিধা ডায়াল দেখা যায় না বলে। শুধু টাইপরাইটারে টাইপ করার সময় দুই হাতের সমান ব্যবহার। বরং বাঁ-হাতির সুবিধাটি একটু বেশি কারণ ইংরেজি টাইপ রাইটারে অধিক ব্যবহৃত বেশিরভাগ অক্ষরই কী-বোর্ডের বামে।

টেলিফোনটির দিকে লক্ষ করে মনে হল এই একটি জিনিস বাঁ-হাতিদের কথা মনে রেখেছে। এর কর্ডটি বাম দিকে লাগানো—তাই একে বাঁ হাতে ধরাটাই সুবিধাজনক। কিন্তু পরে ভাবলাম—সেও তো ডান-হাতির সুবিধার্থেই—ডায়াল করার জন্য, টোকাটুকি করার জন্য ডান হাত মুক্ত রাখতে, অথবা কয়েন টেলিফোনে পয়সা ঢোকাতে।

উজল এখনই গানবাজনার ভক্ত। শিগ্‌গির একদিন হয়তো সে কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখতে চাইবে। কিন্তু বাজনার তারযন্ত্রগুলো এমনভাবে তৈরি যে তাকে সেগুলো ডান-হাতিদের মতো করেই বাজাতে হবে। যেমন বেহালা বা গিটারে আঙুল-সঞ্চালন বাঁ হাতে এবং ছড় টানা বা টোকা দেওয়া ডান হাতে হবে এমনি করেই এরা তৈরি। বাঁ-হাতি কেউ যদি অন্যভাবে এদের বাজাতে চায় তা হলে সারগাম ঠিক রাখার জন্য তারগুলোকে খুলে অন্যভাবে বাঁধতে হবে। তা ছাড়া একটি বড় অর্কেস্ট্রার কথা ভাবা যাক। পাশাপাশি অনেক বেহালাবাদকের মধ্যে বাঁ-হাতি কেউ যদি উলটো দিকে ছড় টানে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সবার ছড় যখন একযোগে ডান দিকে যাচ্ছে, একটি ছড় বাঁ দিকে—কেমন দেখাবে? অবশ্য বাজনার শিক্ষকরা গোড়া থেকে বাঁ-হাতি ছাত্রকেও ডান-হাতির মতো করেই শেখান। দুই হাতই কাজে লাগে বলে তার কাছে সেটি অসুবিধাজনক হয় না।

গাড়ি চালাতে গেলে, হঠাৎ করে সজোরে ব্রেক কষতে হলে সেটি করতে হয় ডান পায়ে। বাঁ-হাতির আবার সেই পা-টাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এখানেও তার অসুবিধা।

আমার হাতিয়ারের বাক্সটি লক্ষ করছিলাম। এতে প্রায় সবগুলো জিনিসই ডান বা বাঁ উভয় হাতেই সমানে ব্যবহার সম্ভব— হাতুড়ি, করাত, পেরেক সব। কিন্তু সেদিন ওয়ার্কশপে পোর্টেবল পাওয়া স'টা (বিদ্যুৎচালিত ছোট করাত) দেখছিলাম, সেটি একেবারেই ডান-হাতি জিনিস। বাঁ হাতে এটি ধরতে হলে হাতকে ঘুরিয়ে আনতে হবে—এক্ষেত্রে সেটি রীতিমতো বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। এসব ব্যাপারে বাঁ-হাতিদের প্রয়োজনটি নিয়ে কেউ কি ভাবে?

এ নিয়ে উজল নিজে কী ভাবে? তাকে কিন্তু বাঁ-হাতি হবার জন্য কখনো বিন্দুমাত্র বেকায়দায় আছে বলে মনে হয়নি। বরং সবার কাছ থেকে এই ক্ষেত্রে আলাদা হওয়াটা সে যেন রীতিমতো উপভোগ করে। একটি ব্যাপার থেকে তার মনোভাব কিছু আঁচ করা যায়। প্রথম প্রথম যখন ডান-হাতি শিক্ষকতার চাপে তার বাঁ হাত মাঝে মাঝে আরশিলিপির মতো উলটো অক্ষর লিখছিল তখন সে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত— 'কটি কোনদিকে লিখব? তোমার দিকে না আমার দিকে?' ভাবখানা এই যে আমি দু'দিকেই পারি, নেহাত তুমি বললে ঐদিকে লিখব।

বাঁ-হাতি

দুই বন্ধুর উপাখ্যান

চব্বিশ বছরের বিলরাশ আর দশটা সাধারণ ছেলের মতো নয়। সে কথা বলতে পরে না, হাঁটাচলা করতে পারে না, এমনকি হাত বা পা কিছু নাড়তে পর্যন্ত পারে না— একেবারে জন্ম থেকেই। কারণ জন্মসূত্রেই মস্তিষ্কে কিছু অনিয়ম নিয়ে জন্মেছিল বিল। কিন্তু বিল মার্ক ডামকে নামক এক ছেলের বন্ধুত্ব লাভ করেছে। এই বন্ধুত্বটি যেন বিলের জীবন বদলে দিয়েছে। বিল এখন আমেরিকার নেব্রাসকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্র। বিলের বন্ধু মার্ক তেইশ বছরের ছেলে— কমপিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। বিলের দুঃসহ জীবনকে সুন্দর সার্থক করে দিয়েছে কমপিউটার সায়েন্সের ছাত্র মার্ক ডামকে।

দুই বন্ধুর উপাখ্যান

মার্ক বিলের উপযোগী করে হেডস্টিক বানিয়ে দিয়েছে। হেডস্টিকটি তামার টিউবে তৈরি, ভিতরটা এক ফুট লম্বা। বিল এটিকে কপালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে। কথাবার্তা চলার জন্য রয়েছে শব্দ ও

অক্ষরসম্বলিত বোর্ড। হেডস্টিকের সাহায্যে ঐ বোর্ডের অক্ষর ও শব্দ স্পর্শ করে বিল বাক্য তৈরি করে কথাবার্তা চালায়। এই বোর্ডটি রাখা হয়েছে বিলের ব্যবহৃত হুইলচেয়ারের সামনে হাত দুটোর মাঝখানে। হুইলচেয়ারে করে বেড়াতে বেরোলে বিল হেডস্টিকটি কপালে আটকে নেয়। স্টিকের সাহায্যে বোর্ডের শব্দ বা অক্ষর ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথাবার্তা বলে। শুধু হুইলচেয়ারেই নয়, নিজের ঘরেও কথাবার্তা বলার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি টেলিফোনেও কথাবার্তা চালাতে অসুবিধা হয় না। বিলের কথাবার্তাগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয়ার কাজটি করে 'কমপিউটারাইজড ভয়েস সিনথেসাইজার'—কমপিউটার-সমন্বিত ধ্বনি-সংশ্লেষক। মার্কই তৈরি করেছে। ফলে কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, এমনকি রাগ দুঃখ ইত্যাদি বোঝাতে বিলের আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এখন। বিলের জন্য মার্ক ভয়েস সিনথেসাইজার ছাড়াও বানিয়েছে বিশেষভাবে তৈরি বাতি, দরজা, অ্যালার্ম-ঘড়ি, রেডিও এবং ক্যাসেট-প্লেয়ার। এগুলো বিল নিয়ন্ত্রণ করে হেডস্টিকের সাহায্যে।

বিল এবং মার্ক— দুজন বন্ধু হলেও, স্বভাবে দুজনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। বিল বেশ অস্থির স্বভাবের। হাত ও পা নাড়তে না পারলেও মাথা তো নাড়তে পারে! হুইলচেয়ারে বসে সে ঘুরে বেড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় ক্লাস করতে। এবং মাসে অন্তত একবার করে হুইলচেয়ারটি মেরামত করতে দোকানে পাঠাতে হয়। পড়াশুনো করবার সময় চারদিকে লোকজন ঘিরে থাকুক— বিল খুব পছন্দ করে। বিলকে সঙ্গ দেয়ার জন্য ঘণ্টা হিসেবে তিন ডলার করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। কিন্তু বিলের ধারণা— যারা তাকে ঘিরে থাকে, তারা তিন ডলারের লোভে নয়, বরং তারা তার কথাবার্তা, গানবাজনার তালিম নেয়া, ঠাট্টা ইত্যাদিতে মজা পায় বলেই থাকে। আর বিল সুযোগ পেলেই হাসাতেও পারে বটে! মেয়েদের প্রতিও তার স্বাভাবিক আগ্রহ আছে এবং জন্মসূত্রে পঙ্গু হলেও মার্কের সহায়তায় সে এখন সচল স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপন করছে।

অথচ মার্ক একদম ভিন্ন স্বভাবের। বিলের স্বাভাবিক কর্মজীবনে মার্কের বিরাট অবদান থাকলেও, শারীরিক অস্তিত্বের প্রশ্নে মার্কের উপস্থিতি প্রায় অদৃশ্যই বলা যায়। মার্ক অনেক বেশি একাকী। গভীর রাতে সবাই যখন বিছানার আঁচলে ঘুমায়, মার্ক তখন কমপিউটার সেন্টারে কাজ করে নিবিষ্ট মনে। আই বি এম কমপিউটারে সে প্রোগ্রামিং যখন করে— মনেই হয় না নেব্রাসকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে। যেন কোন-এক মহাশূন্যচারী সেকেন্ডে এক মিলিয়ন আলোকবর্ষ গতিতে নক্ষত্রমণ্ডলে ঘুরছে।

এত অমিল সত্ত্বেও বলা যায় যে এরা দু'জন দুজনের জন্য পরিপূরক। দুজনই যে-কারো চেয়ে সপ্রতিভ। এরা দুজনই এ-অর্থে বাইরের লোক। বিলের পঙ্গুজীবন, স্বাভাবিক মানুষের কাছে যত কৌতূহলজনকই হোক-না কেন— এ একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এবং মার্কের কমপিউটারে একাগ্রতা—নিছক ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। একথাটা বিল এবং মার্ক দুজনেই জানে। নেব্রাসকা ক্যাম্পাসে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল দুজনে। সেখানে সবাই তাদের দেখেছে ভিন্নগ্রহের বাসিন্দার মতো। তাই মার্ক জিজ্ঞেস করেছে বিলকে— "চলে যেতে চাও?"

বিল হেডস্টিকের সাহায্যে উত্তর দিয়েছে— "হ্যাঁ, এটা অত্যন্ত বিরক্তিকর, চলো যাই।"

বিলের বাবা-মা ওমাহাতে থাকেন। বাবা ও এক ভাই কামার, মা স্কুলের সেক্রেটারি। বিলের বাবা ও অন্যান্য ভাইরা খুব লম্বা। বিলও বোধহয় তা-ই। কিন্তু মাপার উঁপায় নেই। বিল দাঁড়াতে পারে না। বিলের বাবা ভেবেছিলেন, সারাজীবন এই পঙ্গু ছেলের দেখাশোনা তাঁদেরই করতে হবে। অথচ কী আশ্চর্য, গোটা পরিবারে এই আজন্ম পঙ্গু ছেলেটিই কেবল কলেজে পড়েছে, উচ্চশিক্ষিত হয়েছে।

বিলের পেপার, কমপিউটার সিস্টেম ইত্যাদি কিছুই তার বাবা বোঝেন না। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, বিল পরিবারের আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে বিদ্যাবুদ্ধি সবকিছুতে।

বিলের জন্ম হয়েছিল সিজারিয়ান অপারেশন করে। কারণ, নাভিরজ্জু কোনো কারণে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল। এর ফলে, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় তার মস্তিষ্কে অক্সিজেন চলাচল বাধা পায়। তাই সিজারিয়ান করে জন্ম হয়। ঘণ্টাখানেক মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহের অনিয়ম নিয়ে যে-শিশু জন্মাল— সে হাঁটাচলা, কথা বলা, হাত নাড়া কিছুই করতে পারল না। এ-ধরনের দুর্ঘটনা নিয়ে যেসব শিশু জন্মায়, তারা অন্ধ, বোবা বা অপরিপক্ব মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে। সৌভাগ্যক্রমে বিল শুনতে ও দেখতে পারে। মা ছেলেবেলায় তাকে পড়ে শোনাতেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র চার বছর বয়সেই বিল দেখে দেখে পড়তে শেখে। পড়ালেখার হাতেখড়ি বাড়িতেই। বাবা-মা লেখাপড়া শেখানোর জন্য নানা উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। বিলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল, ছেলেবেলা থেকেই সে অবহেলা সইতে পারে না।

বিলের জীবনের পরিপূরক সেই বন্ধু মার্ক ডামকে কমপিউটার সায়েন্সের ছাত্র। টেলিভিশনে 'লস্ট ইন স্পেস' এবং 'স্টারট্রেক' দেখে এবং সায়েন্স ফিকশন পড়ে পড়ে কমপিউটারে তার আগ্রহ জন্মে। তরুণদের বিজ্ঞানমেলায় মার্ক একবার একটা কমপিউটার সার্কিট ও কৃত্রিম হাত দেখায়। কৃত্রিম হাতটি বানানোর প্রেরণা পেয়েছিল কাকার কাটা হাত দেখে। কৃত্রিম হাতটি পুরস্কার পেয়েছিল মেলায়। নেব্রাসকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে মার্ক ভাবতে শুরু করে পঙ্গুদের সত্যিকার জীবন দিতে না পারলেও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক কর্মজীবন দেয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অর্থ বরাদ্দ করে। মার্ক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি সিনাথেসাইজার কিনে নেয়। সেটা খুলে অদল-বদল করে বিলের জন্য ভয়েস সিনথেসাইজার বানায়। এটি বহনযোগ্য ছিল না। বহনযোগ্য ভয়েস সিনথেসাইজার বানানোর জন্য মার্ককে আরো অর্থ দেয়া হয়। এবং মার্ক সত্যি সত্যিই বানিয়েও ফেলে।

এগারো বছর বয়সেই বিলকে বানান করার বোর্ড ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার দেয়া হয়। এবং এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য রাশ পরিবারের বন্ধু একটি হেডস্টিক বানিয়ে দেন।

মর্কের সায়েন্স ফিকশন পড়া কল্পনা বিলের জন্য বানিয়ে দিল ভয়েস সিনথেসাইজার বা বায়োনিক ভয়েস ; বিশেষভাবে তৈরি বাতি, দরজা, অ্যালার্ম ঘড়ি, রেডিও, ক্যাসেট-প্লেয়ার ইত্যাদি। বন্ধুত্বের, সহমর্মিতার, বিজ্ঞানের, জীবনাকাঙ্ক্ষার এমন সুন্দর রূপায়ণ কবে কে দেখেছে?

তোমার হর্স পাওয়ার কত?

তুমি যখন পানি তোলার একটা পাম্প কিনতে যাবে, বা অন্য যে-কোনো ইঞ্জিন, তখন তোমার বলতে হবে কত জোরালো ইঞ্জিন তোমার চাই। সাধারণত হর্স পাওয়ার অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষমতা নামক এককে এটা বলা হয়। কোথায় ইঞ্জিন, আর কোথায় ঘোড়া; নামটা অদ্ভুত, তা-ই না? আসলে এই নামটির উৎপত্তি বহুদিন আগে। তোমরা হয়ত জানো যে জেম্‌স ওয়াট প্রথম যুগের বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর ইঞ্জিন বেচতে গেলেন তখন খদ্দেররা তাঁকে জিজ্ঞেস করল তাঁর এই ইঞ্জিন ক'টি ঘোড়ার সমান কাজ করতে পারবে? কারণ সে-যুগে ঘোড়াই মানুষের জন্য পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো করত। তুলনা তাই করতে হল ঘোড়ার শক্তির সাথেই।

জেম্‌স ওয়াট দেখলেন একটা ঘোড়া ৫৫০ পাউন্ড ওজনের জিনিস সেকেন্ডে এক ফুট করে টেনে তুলতে পারে। এরকম ক্ষমতার ইঞ্জিনকে তাই তিনি বললেন এক ঘোড়ার ইঞ্জিন— এক হর্স পাওয়ার। সেই থেকে এককটা চলে আসছে। আজ অবধি গাড়ি, এরোপ্লেন ইত্যাদির ইঞ্জিনসহ সবকিছুর ক্ষমতা এভাবেই মাপা হচ্ছে। মানুষেরও অবশ্য কাজ করার একটা ক্ষমতা আছে, সেটাও হর্স পাওয়ারে মাপা সম্ভব। কোনো লোক যদি ৫৫ পাউন্ড ওজনের জিনিস সেকেন্ডে এক ফুট হারে টেনে তোলে তা হলে সে জএ(১,১০) হর্স পাওয়ার ক্ষমতায় কাজ করছে।

তোমার হয়তো ইচ্ছে করছে তোমার নিজের কাজ করার ক্ষমতা কতখানি তা মেপে দেখতে— ঘোড়ার শক্তির হিসেবে এর একটা সহজ উপায় আছে বইকী। কীভাবে তোমার হর্স পাওয়ার মাপবে তার বর্ণনা নিচে দেয়া হল :

১. বেশ লম্বা একটা সিঁড়ি খুঁজে নাও। সিঁড়ির ধাপগুলো যেন ভাঙা বা পিচ্ছিল না হয়।

২. সিঁড়ির প্রতি ধাপের উচ্চতা মেপে নাও।

৩. সিঁড়িতে ক'টি ধাপ আছে তা গুনে নিয়ে, এই সংখা দিয়ে প্রতি ধাপের উচ্চতাকে গুণ করো। এর থেকে তুমি সিঁড়র নিচ থেকে উপরে খাড়া দূরত্ব কতখানি তা পেয়ে যাবে। এই সবকিছু মাপজোখ ফুটের হিসেবে করবে।

৪. এবার তোমার কোনো বন্ধুর সহায়তা নিতে হবে। তার কাছে থাকবে সেকেন্ডের কাঁটাওয়ালা একটা ঘড়ি। তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে স্টপওয়াচটা ধার নিতে পারলে আরো ভালো হয়। তোমার বন্ধু ঘড়িহাতে সিঁড়ির ধারে দাঁড়াবে, আর দেখবে নিচ থেকে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে তোমার ঠিক কয় সেকেন্ড লাগল। ওঠার সময় তুমি এক লাফে দুই তিন ধাপ পার হলেও কোনো ক্ষতি নেই। রেলিং-এ হাত রেখে উঠতেও দোষ নেই।

৫. এবার তোমার হর্স পাওয়যার বের করতে নিচের হিসেবেটা ব্যবহার করো :

$$\text{হর্স পাওয়ার} = \frac{\text{সিঁড়ির মোট খাড়া দূরত্ব} \times \text{পাউন্ডে তোমার ওজন}}{৫৫০ \times \text{যত সেকেন্ড লাগল}}$$

উদাহরণ স্বরূপ, তোমার ওজন যদি ১০০ পাউন্ড হয়, সিঁড়ির তলা থেকে উপর পর্যন্ত উচ্চতা হয় ৩৩ ফুট, আর এটা উঠতে তোমার দশ সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে—

$$\text{হর্স পাওয়ার} = \frac{৩৩ \times ১০০}{৫৫০ \times ১০} = \frac{৩}{৪}$$

অর্থাৎ কিনা তোমার কাজ করার ক্ষমতা জেম্‌স ওয়াটের ঘোড়ার তিন পঞ্চমাংশ।

সন্দেহ, আবিষ্কার এবং একটি বই

অনেক দিন আগের কথা। ভারতের সিংহাসনে তখন মুঘল সম্রাট আকবর, আর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে রানি প্রথম এলিজাবেথ। সেখানে উইলিয়াম হার্ভে নামে পনেরো বছরের এক ছেলে এসেছে কেম্ব্রিজে ডাক্তারি পড়তে। তার কিন্তু বিশেষ উৎসাহ শারীরবিদ্যায়—বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ কেটেকুটে দেখায়। এখানে পড়া শেষ করে হার্ভেকে যেতে হল ইতালিতে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে-সময় ভাল ছাত্ররা তাদের লেখাপড়া শেষ করার জন্য ওখানে যেত, কারণ বহু জ্ঞানীগুণী তখন সেখানে অধ্যাপনা করেন। তাঁদের একজন ছিলেন নামজাদা শারীরবিদ ফ্যাব্রিসিয়াস। গ্যালিলিও নূতন নূতন ধারণা এনে ওখানে নানা চমক সৃষ্টি করছিলেন বটে, কিন্তু ঐ ফ্যাব্রিসিয়াস আর তাঁর সহকর্মীরা শরীর সম্বন্ধে যা শেখাতেন তা ছিল নিতান্তই পুরানো দিনের কথা, কোনো সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে তা-ই দিব্যি শেখানো হত।

হার্ভে শিগ্‌গির ফ্যাব্রিসিয়াসের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠল। কিন্তু শিক্ষকের অনেক কথাই সে মেনে উঠতে পারছিল না। তিনি শেখাতেন মানুষের হৃৎপিণ্ডটি একটি তেলের প্রদীপের মতো তাপ উৎপাদন করে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত বয়ে নেবার যে-ধমনি রয়েছে, আর হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্ত নিয়ে আসার যে-শিরা এগুলোর মধ্যে কোনো সংযোগ নেই এটাই ছিল তাঁর ধারণা। ধমনি যে রক্ত বহন করে তাতে থাকে 'জীবনীশক্তি' আর তাপ। আর শিরার কাজ? সে শুধু কলজে থেকে খাদ্যবস্তু নিয়ে আসে। রক্ত সবসময় শরীরের কাজ করতে গিয়ে ফুরিয়ে যায়, তাই হৃৎপিণ্ডের কাজ নূতন নূতন রক্ত তৈরি করা। এসব ধারণা শুধু ফ্যাব্রিসিয়াসের নয়, ও-সময়ের সব শারীরবিজ্ঞানীরই এ-ই ছিল অভিমত। কিন্তু তরুণ হার্ভের মন কিছুতেই এতে সায় দিচ্ছিল না।

মন যে তার সায় দিচ্ছিল না, সে নেহাত খেয়ালখুশি বশে নয়। সেই কেম্ব্রিজ কলেজে যাওয়ার দিনগুলো থেকেই হার্ভে মাছের ও সাপের হৃৎপিণ্ডকে তালে তালে স্পন্দিত হতে দেখেছে। প্রত্যেকবার স্পন্দনের সাথে মাছের স্বচ্ছ ধমনি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়তেও সে দেখেছে—একটা পাম্পের মতোই। একবার খুব দুঃখজনক একটা ঘটনার মধ্যেও হার্ভে ব্যাপারটি লক্ষ করেছিল। ওর দুজন সহপাঠীর মধ্যে এমন মারপিট লাগল যে একজন অন্যজনের বুকে ছুরি মেরে বসল। সহপাঠীর সাহায্যে ছুটে গিয়ে হার্ভে লক্ষ করল ফিনকি দিয়ে থেমে থেমে এমনভাবে রক্ত তার শরীর থেকে বেরুচ্ছিল যেন ঐ কাটা জায়গা থেকে কেউ রক্ত পাম্প করে বের করে দিচ্ছে। এসব কথা হার্ভের মনে ছিল।

ফ্যাব্রিসিয়াসের ক্লাসে দেখানো হয়েছিল যে হৃৎপিণ্ডের ভেতর আর শিরার মধ্যে আছে একমুখী কিছু দরজা। হার্ভের তখুনি খেয়ালে আসল পাদুয়ার কারিগরি বিভাগে পানির পাম্পের কথা। ওখানে গিয়ে সে লক্ষ করল পাম্পের ভাল্‌ব অর্থাৎ দরজাগুলোকে, কাজটি অবিকল সেই হৃৎপিণ্ড বা শিরার দরজার মতোই। এবার তার সত্যি মনে হল হৃৎপিণ্ডটি ঠিক একটি পাম্পের কাজ করছে না কি!

তারপর যথারীতি পাশ-করা ডাক্তার হয়ে হার্ভে ফিরে এসেছেন ইংল্যান্ডে। সেখানে তিনি শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে পড়াতেও শুরু করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরীক্ষা করে হৃৎপিণ্ড আর রক্তসঞ্চালন সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলোকে নিশ্চিত করার চেষ্টা চালালেন। তারপর একদিন সব খুলে বলার দিন এল। ১৬১৬ সালের ১৭ এপ্রিল তিনি সুধীজনের সামনে এক স্মরণীয় বক্তৃতা দিলেন। শুরুই করলেন এই বলে—"হৃৎপিণ্ড একটি পাম্প। শরীরে রক্তের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট। ঐ নির্দিষ্ট রক্তই পাম্প হয়ে সারা শরীর ঘুরে যাচ্ছে বারবার। প্রথমে রক্তকে পাঠানো হয় ফুসফুসে। সেখান থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে এলে তাকে পাম্প করে পাঠানো হয় সারা শরীরে। এভাবে সঞ্চালিত হবার সময় রক্ত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে এবং তা শরীরের সব জায়গায় নিয়ে যায়।"

হার্ভে এই যুগান্তকারী কথাগুলো শুধু বললেনই না, সবার সমানে কয়েকটি পরীক্ষা করে এমন অকাট্য যুক্তি দেখালেন যে তাঁর মতকে উপস্থিত সবাই স্বীকার করে নিলেন। অবশ্য হৃৎপিণ্ডের কাজের সব কথা তিনি বলতে পারেননি। রক্ত ফুসফুসে গিয়ে কী করে তাও তিনি বলতে পারেননি। ধমনি ও শিরার মধ্যে সংযোগ যে আছে তা তিনি বলেছেন, কিন্তু যে-সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো এই যোগসাধন করে তা তিনি দেখাতে পারেননি। কিন্তু সব সন্দেহের উপরে তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করে, রক্ত তৈরি করে না। আর রক্ত শরীরে বারবার সঞ্চালিত হচ্ছে।

১৬২৮ সালে এইসব তত্ত্ব নিয়ে তিনি একটা বই প্রকাশ করলেন। এর নাম : 'প্রাণীর দেহে হৃৎপিণ্ড আর রক্তের গতি সম্পর্কে'। ৭২ পৃষ্ঠার ছোট একটি বই। কিন্তু এটি মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এখন পর্যন্ত একে নূতন তত্ত্ব পরিবেশনকারী বইয়ের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বলে বিবেচনা করা হয়।

থার্মোমিটার

যেই-না 'থার্মোমিটার' শব্দটি বলেছে অমনি সবাই বলবেন, এ তো আমাদের চেনা জিনিস, বাসায় একটি রয়েছে জ্বর দেখার জন্য। হ্যাঁ, ঐ জ্বর দেখার জন্য যেটি সেটিই আমাদের সবচেয়ে পরিচিত থার্মোমিটার। ওটি থার্মোমিটার, কারণ তা উত্তাপ মাপতে পারে। যা-কিছু উত্তাপ মাপতে সাহায্য করে তা-ই থার্মোমিটার। এই পরিচিত থার্মোমিটার তৈরি হয়েছে কাচের সরু নলের মধ্যে পারদ পুরে। উত্তাপে সব বস্তুর মতো এই পারদের স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বাড়ে। দৈর্ঘ্যের এই বাড়া-কমা দেখে আমরা বলতে পারি উত্তাপ কতখানি।

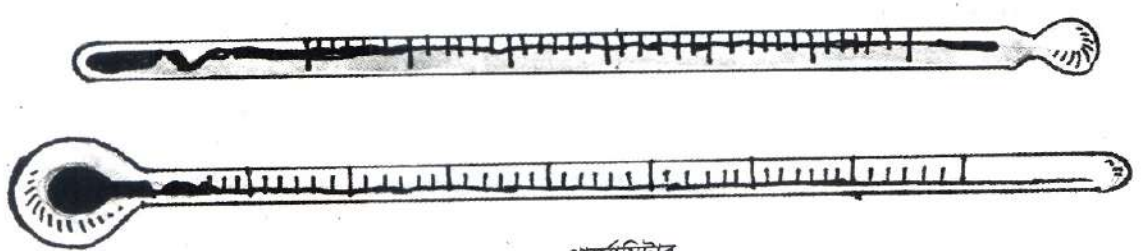

থার্মোমিটার

কতখানি দৈর্ঘ্যকে কতখানি উত্তাপ বলব সেটি অবশ্য আমাদের ব্যাপার। এক হিসাবে সবাই মিলে ঠিক করেছি গলন্ত বরফের যে-উত্তাপ তাকে আমরা বলব শূন্য ডিগ্রি আর ফুটন্ত পানির বাষ্পের যে-উত্তাপ তাকে বলব একশো ডিগ্রি। এটি সেলসিয়াস স্কেল, যা আমরা সবসময় এখন ব্যবহার করছি। পারদভর্তি কাচনলের গায়ে দাগ কেটে আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি পারদের স্তম্ভ কোথায় গিয়ে পৌঁছালে তাকে কত ডিগ্রি উত্তাপ বলব।

দৈনন্দিন যেসব উত্তাপ আমাদের মাপার প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো সব ঐ কাচনল পারদের থার্মোমিটারেই মাপা চলে বলে আমরা অনেকে ভেবে বসি যে ওটাই একমাত্র থার্মোমিটার। আসলে কিন্তু থার্মোমিটার হতে পারে বহু রকমের : যাদের সঙ্গে নীতিতে, আকারে, চেহারায় এই পরিচিত থার্মোমিটারের কোনো মিলই নেই।

আমাদের অভ্যস্ত উত্তাপসীমার গণ্ডির একটু বাইরে গেলেই এই কাচনলে— পারদ-থার্মোমিটারে বিপত্তি ঘটে। উত্তাপ বরফের চেয়ে ৩৯ ডিগ্রি কম হলেই পারদ জমে কঠিন হয়ে যায়। পারদের বদলে অ্যালকোহল ব্যবহার করে অবশ্য সীমা খানিকটা বাড়ানো যায়। কিন্তু মাত্র ৭৯ ডিগ্রি উত্তপ্ত হলেই অ্যালকোহল বাষ্প হয়ে যায়। সেখানেও তাই বিপত্তি। এই একটুতেই এ জাতীয় থার্মোমিটারের ক্ষমতা ফুরিয়ে যাচ্ছে। অথচ উত্তাপের নিম্নসীমা আর ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে অনেক বিস্তৃত— একদিকে পরম শূন্যের

কাছাকাছি অর্থাৎ বরফের চেয়ে ২৭৩ ডিগ্রির মতো নিচে আর অন্য দিকে দশ কোটি ডিগ্রি যেটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের কেন্দ্রভাগের উত্তাপ।

আসলে উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় পদার্থের এরকম যে-কোনো গুণকে ভিত্তি করে থার্মোমিটার তৈরি হতে পারে। উত্তাপে বস্তু প্রসারিত হয় এই নিয়মের ভিত্তিতে যেমন তৈরি হয়েছে কাচনল পারদ-থার্মোমিটার, তেমনি অন্যান্য উত্তাপনির্ভর গুণও ব্যবহৃত হতে পারে। আরো অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য থার্মোমিটার হল ধাতব তারের বৈদ্যুতিক রোধকতার ভিত্তিতে তৈরি রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটার। এতে কাচের নলের মধ্যে রাখা প্লাটিনাম তারের একটি কুণ্ডলীর বৈদ্যুতিক রোধকতা সূক্ষ্মভাবে মাপার ব্যবস্থা থাকে। উত্তাপ যত বেশি হয় রোধকতা তত বাড়ে এবং তার পরিমাপ থেকেই বোঝা যায় উত্তাপ কতখানি। বস্তুর বৈদ্যুতিক রোধকতা মাপার অত্যন্ত নিখুঁত সূক্ষ্ম পদ্ধতি রয়েছে বলে এই থার্মোমিটার খুবই নিখুঁত হতে পারে এবং এর দ্বারা এক ডিগ্রির অতি ছোট ভগ্নাংশ পর্যন্ত শুদ্ধ করে উত্তাপ মাপা সম্ভব। তা ছাড়া উত্তাপের এমন একটি বিস্তৃতির উপর এই থার্মোমিটার দিয়ে পরিমাপ সম্ভব কাঁচনল-পারদের থার্মোমিটারে যার প্রশ্নই ওঠে না।

স্বাভাবিকভাবেই রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটারের চেহারাটি হবে একেবারেই ভিন্ন। এতে একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কাচনলে ঢোকানো থাকে মাইকার কাঠামোয় জড়ানো প্লাটিনাম তারের একটি দীর্ঘ কুণ্ডলী। তারপর থাকে রোধকতা মাপার জন্য মিটার এবং ব্রিজ, সঙ্গে চাই একটি ব্যাটারিও।

বৈদ্যুতিক গুণ ব্যবহৃত হয় আরো একধরনের থার্মোমিটারে, তবে সেটি ভিন্ন এক বৈদ্যুতিক গুণ। থার্মোকাপল অর্থ্যৎ তাপযুগল নামে পরিচিত একটি কৌশল হল এই থার্মোমিটারের ভিত্তি। কৌশলটি অতি সরল। দুটি ভিন্ন ধাতুর তারকে দুই প্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে মুচড়ে দিয়ে দুটি জংশন তৈরি করা হয়। এই জংশন দুটির মধ্যে যদি উত্তাপের পার্থক্য থাকে তা হলে এদের মধ্যে একটি ছোট ভোল্টেজ দেখা দেয় যা ভোল্টমিটার জাতীয় যন্ত্রে পরিমাপ সম্ভব। একটি জংশনকে গলন্ত বরফের উত্তাপের মতো একটি জানা নিত্য উত্তাপের মধ্যে রেখে দিতে হয়। তখন অন্য জংশনের যে-কোনো উত্তাপ উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাপের মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে জানা সম্ভব। তাপযুগলের জন্য তারের বহুরকম জোড়া ব্যবহার করা যায়। যেমন একটি তার হতে পারে প্লাটিনামের, অন্যটি প্লাটিনাম ও রোডিয়ামের একটি সংকর ধাতুর। সেক্ষেত্রে বেশ উচ্চ উত্তাপ মাপার জন্য উপযুক্ত একটি থার্মোমিটার পাওয়া যায়। আবার একটি তামার তার আর অন্যটি কনস্টানটান নামক সংকর ধাতুর তার নিলে মধ্যম ও নিম্ন উত্তাপে ভালো পরিমাপ পাওয়া যায়। অনেক উচ্চ উত্তাপ যেমন আড়াই হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি উত্তাপ মাপার জন্যও তাপযুগলের ব্যবস্থা করা যায়। সেক্ষেত্রে নেওয়া যায় টাংস্টেনের তার এবং টাংস্টেন ও রেনিয়ামের সংকর ধাতুর তার। এমনিভাবে সঠিক তাপযুগল নিয়ে উত্তাপের অনেক বিস্তৃতির উপর পরিমাণ করা যায়।

থার্মোকাপল থার্মোমিটারের একটি বড় সুবিধা হল দুটি তারের প্রান্তের ছোট্ট জংশনটি উত্তপ্ত বস্তুর সঠিক জায়গায় অনায়াসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে জবরজং জটিল যন্ত্রপাতির বিভিন্ন সূক্ষ্ম অংশেও থার্মোমিটার স্থাপন সম্ভব হয়। ঐখান থেকে দুটি সরু তার মাত্র বেরিয়ে আসে এবং সেগুলো দূরে মিটার ইত্যাদিতে নিয়ে যাওয়া যায়।

উত্তাপ যখন অনেক উচ্চে চলে যায়, তখন কিন্তু ব্যবহার করতে হয় আলোক পাইরোমিটার নামক অন্য থার্মোমিটারে। এত উচ্চ উত্তাপের সংস্পর্শে থার্মোমিটারকে আনা যাবে না। তাই পাইরোমিটার-

এর উত্তাপ মাপে দূরে থেকে উত্তপ্ত বস্তুর দ্বারা নিঃসৃত আলোর রং দেখে। এর নীতিটি কিন্তু আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়। কামার যখন গনগনে কয়লার ভেতর থেকে উত্তপ্ত দা'টি বের করে আনেন তখন এটি কতখানি কীরকম লাল বা সাদা হয়ে আছে তা থেকেই আন্দাজ করতে পারেন এটি কত গরম হয়েছে। কোনো বস্তুকে অনেক উত্তপ্ত করতে থাকলে শুরুতে অনুজ্জ্বল লাল, তারপর উজ্জ্বল লাল, আরো উত্তাপে কমলা, তারপর হলুদ এবং সাদা হয়ে অবশেষে অতিউচ্চ উত্তাপে নীলচে সাদা রং এর থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে। মহাকাশের কিছু তারার নীলচে রং দেখে বোঝা যায় যে এর তলদেশের উত্তাপ পঞ্চাশ হাজার ডিগ্রির মতো।

আলোক পাইরোমিটারের মধ্যে থাকে বিশেষ একটি বৈদ্যুতিক বাতি এবং একটি লাল আলোক ফিল্টার। বৈদ্যুতিক বাতির মধ্যে দেওয়া কারেন্টকে একটি নিয়ন্ত্রক ঘুরিয়ে কমবেশি করা যায়। পরিমাপকারী ব্যক্তি পাইরোমিটারের ভেতর দিয়ে উত্তপ্ত বস্তুটির দিকে তাকান আর বাতির কারেন্ট বাড়াতে থাকেন যতক্ষণ না উত্তপ্ত বস্তুর পটভূমিতে বাতির উজ্জ্বল ফিলামেন্টটি অদৃশ্য হয়ে যায়। যেই কারেন্টে এই অদৃশ্য হবার ঘটনাটি ঘটল সেই কারেন্টের পরিমাপ থেকেই বোঝা যায় উত্তপ্ত বস্তুটির উত্তাপ কত। কাজেই পাইরোমিটারে কারেন্ট মাপার একটি যন্ত্র থাকতে হয়।

বাতির ফিলামেন্টকে যদি উত্তপ্ত বস্তুর পটভূমিতে বেশি সাদা দেখায় তা হলে ফিলামেন্টের উত্তাপ বস্তুটির চেয়ে বেশি, তাই কারেন্ট কমাতে হবে। আর যদি লাল দেখা যায় তা হলে ফিলামেন্টের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম, কারেন্ট বাড়াতে হবে। উভয়ের সমান উত্তাপ হলে ফিলামেন্টটি অদৃশ্য হবে। সেই কারেন্টটিই সঠিক।

এত বিচিত্র থার্মোমিটারের কথা শোনার পর আর কি আমরা জ্বর দেখার ছোট্ট কাচনল-পারদের যন্ত্রটিকেই একমাত্র থার্মোমিটার মনে করব ?

রক্তচাপ মাপার যন্ত্র

ডাক্তার সাহেবকে প্রায়ই একটা যন্ত্র তুমি ব্যবহার করতে দেখবে। দু'এক কথা জিজ্ঞেস করার পরই তিনি রোগীর হাতটা একটা চাওড়া ফিতার মতো জিনিস দিয়ে বেশ পেঁচিয়ে বাঁধেন। কেমন করে জানি তিনি এটা টাইট দেন হাতকে ভালোভাবে সেঁটে ধরার জন্য। তারপর কানে অতিপরিচিত স্টেথেসকোপটা লাগিয়ে, সেটা বাগিয়ে শুরু তাঁর কীসব মাপজোখ। রোগের পরীক্ষায় ভারি জরুরি এসব। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

আসলে এ দিয়ে তিনি তোমার রক্তচাপ মাপছেন। তোমার হৃৎপিণ্ড সবসময় সারা শরীরে রক্ত পাম্প করে যাচ্ছে, ধুকধুক করে। তুমি বিশ্রামে থাকার সময় সাধারণত মিনিটে ৭২ বার করে এটা ধুকধুক করে। আর প্রত্যেকবার বেশ খানিকটা রক্ত এর থেকে বের হয়ে ধমনিগুলো দিয়ে শরীরে সজোরে ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত যাবার সময় রক্তনালির দেয়ালের ওপর এর যে-চাপ পড়ে তাকেই আমরা রক্তচাপ বলছি। চাপ যে একটা আছে তা তুমি নিজের হাতের নাড়ি টিপে দেখলেই সহজে বুঝতে পারবে। কবজির ভেতরের দিকে ঠিক জায়গায় হাত রাখলে কেমন টিকটিক করে না ? রক্ত পাম্প করার সময় তুমি এই নাড়ি পাও। এর ওপর আঙুলের চাপ বাড়াতে থাকলে এক-সময় মনে হবে নাড়ি আর পাওয়া যাচ্ছে না। দেখবে ভেতরে রক্তের চাপকে এভাবে নাকচ করার জন্য তোমার আঙুলকেও চাপ দিতে হচ্ছে নেহাত কম না। কাজেই রক্তের বেশ একটা চাপ আছে বইকী।

রক্তচাপটা স্বাভাবিক কি না তা ডাক্তারের জানাটা খুব জরুরি। রোগ বের করতে এটা প্রয়োজন হতে পারে। নানা কারণে রক্তচাপ অনেকখানি বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে। বিভিন্ন অসুখের ফলে এসব ঘটতে পারে। যেমন ধরো শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটা ধমনির নালিটা কোনো কারণে সরু হয়ে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে আসছে। এরকম অবস্থায় এর ভেতর দিয়ে রক্ত-চলাচল বাধা পায় বলে নালির উপর রক্তের চাপ বেড়ে যায়। তাই ক্রমাগত অস্বাভাবিক রক্তচাপ দেখা দিলে ডাক্তাররা নানা রোগ সন্দেহ করতে আরম্ভ করেন।

আসলে রক্তের যে-চাপ মাপা হয় তা একটা নয়, দুটা। হৃৎপিণ্ড সংকোচনের ফলে এর থেকে রক্ত বেরুবার সময় যে-রক্তচাপ তাকে বলা হয় সিস্টোলিক চাপ। আর দুবার সংকোচনের মাঝখানটায় হৃৎপিণ্ড যখন বিশ্রামের অবস্থায় থাকে সে-সময়ের চাপকে বলা হয় ডায়াসটোলিক চাপ। শেষের চাপটা থেকে বোঝা যায় রক্তনালি রক্ত চলাচলে কতখানি বাধা দিচ্ছে। ডাক্তার সাহেব যখন মাপজোখের পর রক্তচাপটা কাগজে টুকে রাখেন, তখন পাশাপাশি দুটা চাপই লিখে রাখেন।

যে-যন্ত্রের কথা বলছিলাম তার কথায় ফিরে যাওয়া যাক। রক্তচাপ মাপার এই যন্ত্রের ডাক্তারি নাম 'স্ফিগমোমেনোমিটার'। নামটা রীতিমতো খটমটে হলেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওটা তোমার উচ্চারণ

করে না বললেও চলবে— কারণ সাদা কথায় এর মানে 'নাড়ির চাপ মাপার যন্ত্র' বই কিছু নয়। তা ছাড়া যন্ত্রটা আসলে বেশ সরল একটা জিনিস, নাম যতই খটমটে হোক-না কেন। ফিতার মতো যে-জিনিসটা বাহুতে জড়ানো হয় সেটা আসলে একটা রাবারের ব্যাগ যাকে বেলুনের মতো ফোলানো যায়। এর সাথে সংযুক্ত থাকে পারায় ভর্তি একটা খাড়া কাচের নল। ব্যাগের মধ্যে বাতাসের চাপ বাড়লে-কমলে তা নলের ভেতর পারার স্তম্ভের উচ্চতা বাড়ায়-কমায়। পারার স্তম্ভটা কতখানি উঁচু করে ধরে রাখতে পারে তা-ই বলে দেবে ব্যাগের ভেতরে বাতাসের চাপ কতখানি। স্কুলে ব্যারোমিটারের কথা যদি পড়ে থাকো তা হলে বুঝবে ব্যাপারটা হুবহু একই। ব্যারোমিটারে মাপা হয় বায়ুমণ্ডলের চাপ। আর এখানে ব্যাগের ভিতরের বায়ুচাপ। এনরয়েড ব্যারোমিটারে যেমন পারা লাগে না, মিটারে কাঁটা ঘোরা দেখে চাপ বোঝা যায়, তেমনি এই ক্ষেত্রেও সেরকম ভিন্ন যন্ত্রও আছে যার পারা লাগে না, শুধু ঘড়ির মতো একটা মিটার থাকে।

তুমি হয়তো বলবে মাপতে চাই রক্তের চাপ, আপনি ব্যবস্থা দিচ্ছেন রাবারের ব্যাগের ভেতরে বায়ুর চাপ মাপার । ঐ যে ব্যাগটা হাতে জড়ানো হল ব্যান্ডেজের মতো তাতেই রক্তচাপ মাপা সম্ভব হচ্ছে। জড়ানোর পর একটা হাত-পাম্পের সাহায্যে (রাবারের একটা বল টিপে টিপে) ঐ ব্যাগটার ভেতর আস্তে আস্তে বাতাস ঢোকানো হয়। যতই তা ফুলবে ততই হাতের উপর চাপ পড়বে আঁটসাঁট হয়ে। একটি অবস্থা আসবে যখন এর চাপে হাতের ধমনিতে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এটি যখন ঘটবে ঠিক সেই সময় ঐ হাতের কবজিতে নাড়ি আর পাওয়া যাবে না। আর ঠিক সেই অবস্থায় ডাক্তার সাহেব স্টেথেসকোপটা কনুইয়ের কাছে ধমনিতে লাগিয়ে শুনতে থাকবেন আর ধীরে ধীরে ব্যাগের বাতাস বের করে দিতে থাকবেন। রক্ত-চলাচল আবার শুরু হবে। শোনার কাজটা স্টেথেসকোপ দিয়ে করা হয়, কারণ তোমরা তো জানোই এতে অল্প শব্দও স্পষ্ট করে শোনা যায়।

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে তিনি বুঝবেন প্রথম কোন সময়টিতে রক্তের নিয়মিত ঝলকের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক ঐ সময়টিতে ব্যাগের ভেতরে বাতাসের যেই চাপ এটাই রক্তের সিস্টোলিক চাপ। এই সময় ধমনি একেবারে বন্ধ নয়, একেবারে খোলা নয়। প্রত্যেকবার হৃৎপিণ্ড সংকোচনের সময় রক্তের চাপে অল্পক্ষণের জন্য এটা খোলে। তাই এই চাপ রক্তের সিস্টোলিক চাপ।

এবার আরো বাতাস ব্যাগ থেকে বের করতে থাকলে ধমনির ওপর শব্দটা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকবে। কারণ এ-সময় ধমনি একেবারেই খুলে যাবে আর রক্ত-চলাচল থেমে থেমে না হয়ে একনাগাড়ে হবে। এই অবস্থায় পৌঁছানোর সাথে সাথে ব্যাগের বাতাসের চাপ নিলে তা হবে ডায়সটোলিক চাপ। হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের অবস্থায় রক্তের চাপ যা হয়, এটা তা ই। পুরো খবরটা জানতে হলে ডাক্তার সাহেবের এই দুটা চাপই জানা চাই। ধরা যাক, কারো রক্তচাপ সিস্টোলিক ১৩০ মিলিমিটার পারার চাপ, আর ডায়সটোলিক ৮০ মিলিমিটার পারার চাপ (এটা একটা স্বাভাবিক রক্তচাপের উদাহরণ)। ডাক্তার সাহেব এটা লিখবেন এভাবে— ১৩০/৮০। এর থেকেই সবাই বুঝে নেবে।

মশার কামড়

যত নিকষ কালো রাতই হোক মশা তোমাকে খুঁজে পাবেই। আর পেলে কী করবে তা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না। এই জীবটির প্রতি তোমার প্রচুর বিরক্তি আছে জানি, তবুও একটু কুতূহল থাকতেও দোষ কী?

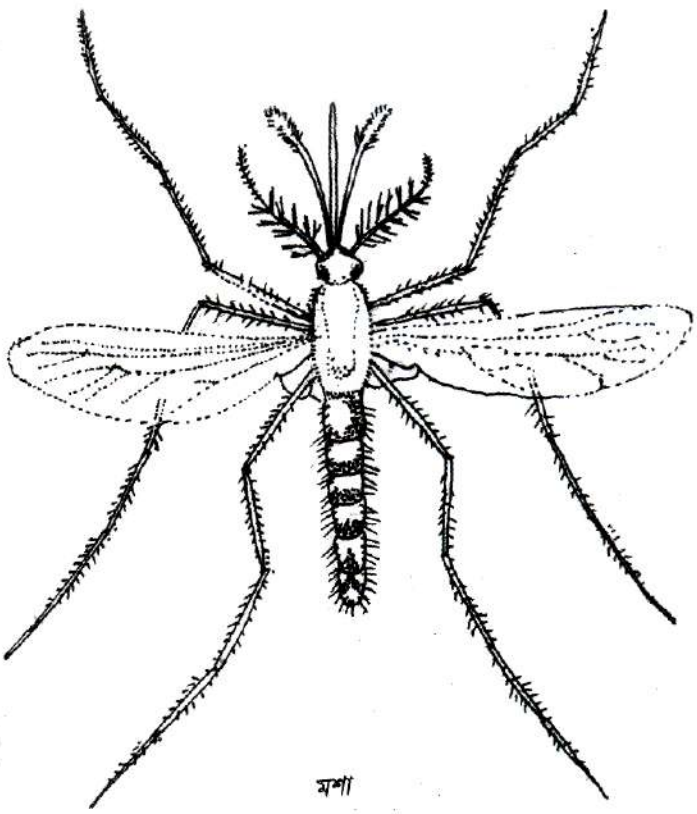

মশা

মশাকে যদি একটা বিমান হিসাবে কল্পনা করো তবে সে বড় ধুরন্ধর বিমান— যে উড়তে উড়তে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, হঠাৎ প্রচণ্ড দৌড় দিতে পারে, আবার চট করে গতি ধীর করতে পারে। চড় মেরে চ্যাপটা করতে গেছ— তার মধ্য থেকে সে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাতে পারে। তা ছাড়া চিত হয়ে ওড়া, পেছন দিকে কি পাশের দিকে ওড়া— এসব ভেলকিবাজিতে তার জুড়ি নেই।

বেশিরভাগ মশা নিশাচর। ওরা কামড়াবার জন্য তোমাকে খুঁজে বের করে কীভাবে? তোমার নিশ্বাসের সাথে বের হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অবস্থিতি বুঝেই মশা তোমাকে খুঁজে বের করে। বাতাসের স্রোতে খানিকটা পরিমাণে এই গ্যাস বেশ দূরে যেতে পারে। সেখান থেকেই মশা তার সামনের দুই শুঁড় আর পায়ের সাথে থাকা সংবেদী অঙ্গ দিয়ে তা বুঝতে পারে। ঐ গ্যাসকে অনুসরণ করে সে তোমার কাছে এসে হাজির হয়। খুব কাছে যখন আসে তখন তুমি শুনতে পাও তার সঙ্গীত। তবে এটা কণ্ঠসঙ্গীত নয়, বলতে পারো বাজনা। কারণ, মশার খুব দ্রুত পাখা সঞ্চালনের ফলেই শব্দটা সৃষ্টি হয়। সেকেন্ডে এটা ২৫০ থেকে ৬০০ বার পাকা নাড়াতে পারে। বুঝে দেখো কী দ্রুত! অবশ্য তাকে প্রত্যেকবার কষ্ট করে পাখা নেড়ে এটা করতে হয় না, পাখার গোড়ায় একটা অদ্ভুত মাংসপেশির সুইচ অন করে দিলে আপনা থেকেই যেন শুরু হয়ে যায় বাজনা।

গ্যাস ধরে তোমাকে মোটামুটি খুঁজে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তুমি একটা যুতসই শিকার কি না, অর্থাৎ তোমার রক্ত উপাদেয় হবে কি না, এটা বোঝার জন্য মশার অন্য যন্ত্র রয়েছে। কাছে আসলে শরীরের আর্দ্রতা, উষ্ণতা আর ঘামের বস্তু থেকে এটা বুঝে নেবে শিকার উপযুক্ত কি না। নানা কারণে এই সময় সে তোমাকে ছেড়ে অন্য কারো দিকে যেতে পারে।

ধরে নিলাম মশা তোমাকে অপছন্দ করেনি। তা হলে সে তোমার খোলা গায়ের কোথাও বসে পড়বে। এই বসাটা হয়তো তুমি টেরও পাবে না, কারণ খুব আলগোছে সে বসতে পারে। এবার তার শোষণযন্ত্র তোমার শরীরে ফুটাবার পালা। মনে কোরো না ইনজেকশনের সুচের মতো সহজ সরল কিছু ঢুকল তোমার শরীরে। বরং যন্ত্রটা বেশ জটিল। এর মধ্যে রয়েছে ছয়-ছয়টি ধারালো জিনিস। প্রত্যেকটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। এর মধ্যে দুটো হল নল— একটা খাবারের আর একটা লালা যাওয়ার। এদের ঘরে দুটা ধারালো ছুরি, তারপর একজোড়া দাঁতালো ছুরি। আগাগোড়া যন্ত্রে একটা পর্দা দিয়ে এই ছয়টি যন্ত্র জোড়া থাকে। এর আগায় ছয়টি ধারালো জিনিসকে একত্রে আটকিয়ে একটা বাণ্ডিলের মতো করে রাখা হয়।

ভাবেসাবে বোঝা যাচ্ছে ইনজেকশনের সুচের মতো মসৃণ জিনিস তো নয়ই, বরং মশার শোষণযন্ত্রকে তুলনা করা যেতে পারে তেলের কূপ খোঁড়ার বিটের সাথে— নানান ধারালো চাকার সমাবেশ যেখানে। অথচ এই জবরজং যন্ত্র দিয়ে যখন তোমার চামড়ায় কূপ খনন শুরু হয় তুমি তা টেরই পাও না। পুরো জিনিসটা—ছয়-ছয়টি ধারালো জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হয় শরীরে। চামড়ার নিচেই রক্তনালির যে সূক্ষ্ম ক্যাপিলারিগুলো জালের মতো বিস্তৃত সেখানে এটা চলে যায়। কোনোরকমে তার একটা নালিকে যদি এটা ফুটো করতে পারে তা হলেই হল। 'ইউরেকা', রক্তের খনি আবিষ্কৃত। এর রক্তস্রোত থেকে পেট পুরে— কি পেট ফুলিয়ে রক্ত নিতে মশার মিনিটখানেকের বেশি লাগার কথা নয়।

এত কিছু হয়ে গেল, তুমি কিন্তু কিছুই জানলে না। জানার কারণটি ঘটে পরে। শোষণের ছয় যন্ত্রের এক যন্ত্র বলেছি লালা-চলাচলের নল। রক্ত চোষা শুরু করার ঠিক আগে মশা তার কিছু লালা ঐ নল দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেয়। তোমার চামড়ার নিচে এই লালা রক্তের সাথে মেশে। এর একটা গুণ হল এটা রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না। নইলে ওঠার সময় মাঝপথে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে সরু নলটিই জাম হয়ে যেত, ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তার কিছু অবশিষ্টাংশ চামড়ার তলে থেকে যায়। এটা ওই জায়গাটা ফুলিয়ে তোলে আর চুলকাতে ইচ্ছে হয় তাকে। সাধারণত তখনই তুমি টের পাও মশার কামড়ের কথা। ততক্ষণে অবশ্য প্রায় ক্ষেত্রেই মশা কাজ সেরে গেছে। মালবোঝাই ভারী উড়োজাহাজ তখন পগারপার। তুমি বৃথাই চড় মেরে চুলকিয়ে মরছ।

তোমার খানিকটা রক্ত নিয়ে গেছে ঠিক এই কারণেই মশার উপর বেশি রাগ করার দরকার নেই। রক্ত খেয়ে মশা ফুলে লাল ডোলটি হল বটে, কিন্তু এরকম পনেরো-বিশবারে খাওয়া রক্ত একত্র করলে তোমার কালির ড্রপারে এক ফোঁটা রক্তের সমান হবে মাত্র। ও তেমন বেশি কিছু নয়। এই রক্তটা মশার খেতে হয় তার ডিম পাড়ার কাজের জন্য। তাই স্ত্রী-জাতীয় মশারই টান রক্তের প্রতি।

মশার উপর আমাদের রাগের সব চেয়ে বড় কারণ এটা রক্ত খেতে গিয়ে মারাত্মক সব রোগের জীবাণু রোগীর দেহ থেকে সুস্থ দেহে নিয়ে আসে। এভাবে রোগগুলো সে ছড়ায়। এর মধ্যে আমাদের দেশের জন্য ম্যালেরিয়ার নাম সবার শীর্ষে। তা ছাড়া মশার কামড়ে জ্বালা-যন্ত্রণা তো আছেই, নাক-মুখের কাছে বিরক্তিকর গুঞ্জনটাই-বা কম কী? কাজেই মশার বিরুদ্ধে চলছে আমাদের নিত্য-সংগ্রাম। সে অবশ্য আরেক কাহিনী।

হার্ট আমার হার্ট

শরীরে যে-অঙ্গটিকে মানুষ জীবনের সাথে, ভালোবাসার সাথে সবচেয়ে বেশি চিহ্নিত করে সেটি হার্ট। অথচ চিকিৎসা গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই হার্ট গুরুত্ব পাচ্ছে সাম্প্রতিককালে, যখন এর বিকল হওয়াটাই মানুষের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হিসাবে সবার চোখে পড়েছে। ঐ যে গুরুত্বটা দেওয়া হয়েছে তার ফলও অবশ্য ফলছে। এ-সম্বন্ধে সুখবর হল হার্টের অসুখের উপর মানুষের বেশকিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর থেকে মৃত্যুর হার এখন কমের দিকে। এ-যুগে এ-অসুখ এমন মহামারির আকারে দেখা দিচ্ছে যে ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান একে 'মানুষের সামনে সবচেয়ে মারাত্মক মহামারি' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কোনো মহামারি নিয়ন্ত্রণে আসে কীভাবে? অবশ্যই আরো ভালো প্রতিষেধক এবং চিকিৎসার মাধ্যমে। কিন্তু যে-কোনো মহামারির নিয়ন্ত্রণ প্রধানত নির্ভর করে সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং সেইসাথে কিছু জরুরি অভ্যাস গড়ে তোলার উপর। হার্টের অসুখ এড়াবার জন্য জরুরি যেসব অভ্যাস সেগুলো বেশ সরল :

১. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে সেটা বন্ধ করতে হবে অথবা একেবারেই কমিয়ে ফেলতে হবে।
২. এমন খাদ্য খেতে হবে যাতে চর্বি ও লবণ খুব কম, বিশেষ করে প্রাণিজ চর্বি।
৩. সবসময় নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, শরীরের পক্ষে যতখানি কঠিন ব্যায়াম সম্ভব ততখানি।
৪. মদ্যপান বাদ দিতে হবে অথবা কমাতে হবে।
৫. শারীরিক ও মানসিকভাবে বিশ্রাম নিতে হবে।

এসব নিয়মের মধ্যে খুব একটা নূতনত্ব যে রয়েছে তা নয়। অতীতেও সুস্বাস্থ্যের জন্য এগুলোর গুরুত্বের কথা বলা হত। কিন্তু আজ হার্টের অসুখের মহামারিতে এরা প্রায় অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়েছে সবার জন্য।

দু'হাজার বছর আগেও চীনদেশের চিকিৎসকদের জানা ছিল যে অতি জটিল এক ধমনিজালের ভেতর দিয়ে রক্তকে ক্রমাগত সঞ্চালন করার জন্য হার্ট একটি পাম্প বিশেষ। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই খবরটি রাখত না বলে সে-জগতে এটা পুনরাবিষ্কৃত করতে হয়েছে ১৬২৮ সালে উইলিয়াম হার্ভেকে—যাঁর 'হার্ট আর রক্তের চলাচল প্রসঙ্গে' নামক পুস্তকটি একটি যুগান্তকারী পুস্তক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একটা পাম্প হিসাবে বর্ণনা করলেই যেন হার্ট সম্বন্ধে সব বলা হয়ে গেল। কিন্তু একবার ভাবতে হয় কেমনতরো এই পাম্প, আর কেমনই-বা এর সংলগ্ন নলগুলো? হাতের মুঠোর সমান এর আকৃতি, পূর্ণবয়স্ক গড়পড়তা মানুষের ক্ষেত্রে ওজন মাত্র ১১ আউন্সের মতো। অথচ এই ছোট্ট পাম্পটিকে রক্ত-সঞ্চালন করতে হয় প্রায় ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ রক্তনালির মধ্য দিয়ে, নিয়ে যেতে হয় রক্তকে শরীরের সহস্র কোটি জীব-কোষের প্রত্যেকটিতে। একটি মানবজীবনের পুরো আয়ুষ্কালে একটানা কাজ করতে হয় একে দৈনিক প্রায় এক লক্ষ বার সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে!

বেঁচে থাকতে হলে হার্টের এই প্রক্রিয়াকে থামানো চলবে না, কয়েক মিনিটের জন্যও নয়, রক্তের সঞ্চালনকে শুধু চলতেই হবে না, তাকে চলতে হবে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে। হার্টের কম্পনের তালে তালে এর বিভিন্ন কপাটগুলো খুলতে হবে, বন্ধ হতে হবে যাতে করে নিলয় থেকে অলিন্দে অথবা ধমনি থেকে নিলয়ে উলটো দিকে রক্ত না যেতে পারে। স্মর্তব্য যে হার্টের রয়েছে চারটি কামরা— উপরে দুটি অলিন্দ, নিচে দুটি নিলয়। সুন্দর ছন্দিত রূপে এরা একের পর এক সক্রিয় হয় প্রতিবার হৃৎকম্পনের সাথে সাথে। এই ছন্দের তালটুকু রাখার দায়িত্ব হল ডান অলিন্দের উপরে থাকা এক-গুচ্ছ সরু স্নায়ুতন্তুর উপর। এখান থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত গিয়ে হৃৎকম্পনের প্রতিটি খুঁটিনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

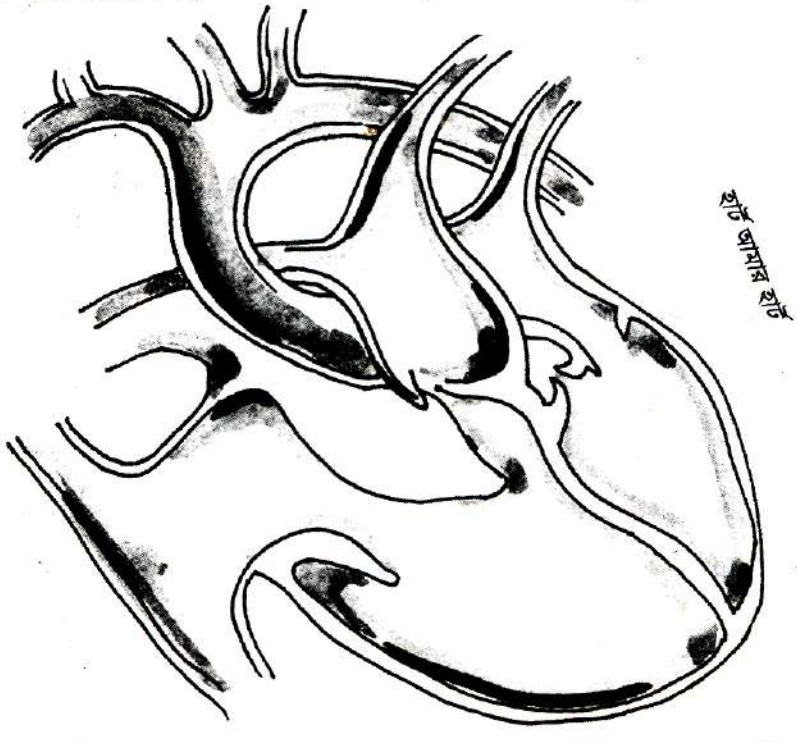

যতই শক্তসমর্থ হোক-না কেন পাম্প আর নলের যে-কোনো ব্যবস্থার মতো হার্টের সঞ্চালন-ব্যবস্থাতেও ত্রুটি দেখা দিতে পারে। কোনো পাম্প-ব্যবস্থায় কীরকম ত্রুটি সাধারণত দেখা যায়? নলগুলো অবাঞ্ছিত বস্তুতে ভর্তি হয়ে জাম হয়ে যেতে পারে, এর কোনোখানে ফুটো হয়ে যেতে পারে, লিক করতে পারে ; আর এসব অঘটনের বিভিন্নটা একই সাথেও দেখা দিতে পারে। প্রতি হাজারে দশ জন শিশুর জন্মের সময়েই ত্রুটিপূর্ণ হার্ট থাকে— হার্টের কপাটগুলোতে লিক থাকতে পার, দুই নিলয়ের মাঝখানের দেওয়ালে ফুটো থাকতে পারে ইত্যাদি। পাঁচ থেকে পনেরো বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে রিউম্যাটিক ফিভার বা বাতজ্বরের প্রকোপ দেখা যায়। এই জ্বরে হার্টের কপাটগুলোতে এমন ক্ষত দেখা দিতে পারে যে এরা ঠিকমতো বন্ধ হতে চায় না, ফাঁক থেকে যায়।

অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয় অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে। এরকম একটি সমস্যা হয় হার্টের কম্পনের তালরক্ষাকারী স্নায়ুতন্তুর গোলযোগে। এই তাল কেটে গেলে কপাট অসময়ে খোলা বন্ধ হতে পারে, ফলে হার্টের কাজে ব্যঘাত ঘটে। এর চেয়ে বেশি সচরাচর যে-সমস্যা দেখা দেয় তার উৎস রক্তবহ নলগুলোর মধ্যে। বহুতর কারণে এসব ধমনিসমূহের দেওয়াল পুরু হয়ে ওঠে এবং এদের

স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় এরা সহজে প্রসারিত ও সংকুচিত হতে পারে না। ধমনির এরকম শক্ত হয়ে যাওয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে এতে চর্বিজাত এক-রকম সঞ্চিত পদার্থ। এই সঞ্চয়ের ফলে ধমনি শক্ত তো হয়ই, এর ভেতরের রক্ত-চলাচল পথটুকুও ক্রমেই সরু হয়ে পড়ে। এরকম সঞ্চয় ধমনির মধ্যে জমাট রক্তের একধরনের ছিপির সৃষ্টিও করতে পারে। ধমনির দেওয়ালে চর্বিজাত সঞ্চয়ের উপর রক্তের প্লেইটলেট নামক কোষগুলো মরে গিয়ে জমে ওঠে। এই স্তূপে সুতার আকৃতিতে ফাইরিল নামক জিনিস গড়ে ওঠে এবং এসব তালগোল পাকিয়ে জমাট-রক্তের শক্ত ছিপি তৈরি হয়, এই ছিপি ক্রমে বড় হয়ে ধমনির পুরো পথটাই বন্ধ করে দিতে পারে অথবা রক্তস্রোত দ্বারা অন্যত্র বাহিত হয়ে অপেক্ষাকৃত সরু অন্য কোনো রক্তনালি বন্ধ করে দিতে পারে।

ধমনি-দেওয়াল শক্ত হয়ে যাওয়া, এর পথ বন্ধ হয়ে আসা এবং আনুষঙ্গিক কিছু রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে ত্রুটির ফলে সৃষ্টি হয় রক্তসঞ্চালনের সব চাইতে ব্যাপক অসুখটি— উচ্চ রক্তচাপ। এর অর্থ ধমনির দেওয়ালের উপর বহমান রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক হয়ে পড়া। উচ্চ রক্তচাপের বড় বিপদ হল এটা সহজে ধরা পড়ে না ; আর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে রক্তনালিতে ততটা নয় যতটা কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের যথেষ্ট ক্ষতিসাধনের পর। এরকম উচ্চ রক্তচাপে পাম্প করতে হলে হার্টকে অতিরিক্ত খাটতে হয়। চাপ খুবই বেড়ে গেলে কোনো রক্তনালি ফেটে গিয়ে লিক দেখা দিতে পারে। রক্তনালিতে বড় রকমের বাধা সৃষ্টি হলে অথবা এর থেকে রক্ত লিক হতে থাকলে দেহের কোনো কোনো কোষকলায় যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত পৌঁছতে পারে না। কোনো কোষকলায় রক্তের সরবরাহ যদি অংশতও বন্ধ হয়ে যায় তা হলে শিগ্‌গির ওটা জরুরি পুষ্টির অভাবে মরে যেতে পারে। এটি যদি মস্তিষ্কের কোষের ক্ষেত্রে ঘটে তা হলে তাকেই বলা হয় স্ট্রোক। স্ট্রোকের ফলে অস্থায়ীভাবে বাক্‌শক্তি বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা থেকে শুরু করে পক্ষাঘাত এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

হার্টের নিজের কোষকলায় যদি এভাবে রক্ত সরবরাহে ঘাটতি ঘটে তা হলে দেখা দেয় করোনারি নামে পরিচিত অসুখগুলো। হার্টের পেশিতে রক্তবাহিত পুষ্টির অভাবে তা দুর্বল হয়ে এর কাজের ব্যাঘাত ঘটায় ; হার্টের দক্ষতা কমে যায়, এখানে ব্যথা অনুভূত হয়। হার্টের করোনারি নামক ধমনিগুলোর পথ যদি এভাবে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় তা হলে মুহূর্তের মধ্যে ঐ ধমনি হার্টের যে-অংশে রক্ত নিয়ে যায় সে-অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। একেই বলা হয় হার্ট অ্যাটাক।

হার্ট অ্যাটাক অনেক সময় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আসে, ইতিপূর্বে কোনোরকম উপসর্গ না ঘটিয়ে। তবে এদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধমনির পথ সরু হবার এবং উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা থাকে দীর্ঘকাল ধরে। একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে বেঁচে গেলে বিশেষ সাবধানতা ও চিকিৎসার মাধ্যমে পরে এ-রোগের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে সংগ্রাম করা যায়। কিন্তু অন্তত অর্ধেক রোগীর ক্ষেত্রে এ-সুযোগ পাওয়া যায় না, কারণ প্রথম অ্যাটাকেই মৃত্যু ঘটে। আজকাল অনেক অকালমৃত্যুর জন্য এই অসুখটি অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে দায়ী।

হার্টের অসুখগুলো সাম্প্রতিককালে এরকম মহামারির আকার ধারণ করল কেন? এ নিয়ে বহু রকম তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। তবে কতগুলো বিষয়কে সাধারণভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে : তামাক প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ধূমপানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এর একটি কারণ। উন্নত খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং অধিক সচ্ছলতার ফলে চর্বিজাতীয় দামি খাবার খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে— এটাও একটি বড় কারণ। বিশেষ করে প্রাণিজ চর্বির মধ্যে থাকে কোলেস্টোরেল নামক জিনিস যা ধমনিতে সেই মারাত্মক সঞ্চয়গুলো জমাতে সহায়তা করে। তা ছাড়া ঐ দামি খাবারগুলোতে শক্তিদায়ী ক্যালোরিও থাকে বেশি যা দেহের ওজন বাড়ায়। অথচ এই মোলায়েম খাবারগুলোতে স্থূল আঁশজাতীয় অংশ কম থাকে বলে

এগুলো যথেষ্ট খেয়েও খুব খাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। এতেও অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। অতিরিক্ত ওজন হার্টের অসুখ ঘটাতে সাহায্য করে, হার্টকে অধিক কাজ করতে বাধ্য করে।

সাম্প্রতিককালে জীবনযাত্রার প্রণালি সহজতর হয়েছে বলে অনেক মানুষের দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রম কমে গেছে। এতে এক দিক দিয়ে হার্টের পেশিসহ শরীরের পেশিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে ; অপর দিকে খাদ্যের সাথে গৃহীত অতিরিক্ত ক্যালোরি ব্যবহৃত হয়ে না গিয়ে বরং ওজনবৃদ্ধি ঘটায়।

হার্টের অসুখের বিপদ-সংকেত পাওয়ার উপায় কী? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছু-না-কিছু সংকেত আগেভাগেই পাওয়া যায়। যেমন শারীরিক পরিশ্রমের পর বুকে ব্যথা অনুভূত হওয়াটা করোনারি হার্ট অসুখের সংকেত হতে পারে। এরকম ব্যথা অনুভূত হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এগুলোকে পেটের গ্যাস বা হজমের গণ্ডগোল বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। অল্প কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঘোরা, মূর্ছা যাওয়া বা দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ অনুভব করা— এসব স্ট্রোক হবার পূর্বেকার উপসর্গ হতে পারে। ঠিক সময় ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি মস্তিষ্কে রক্তবাহী কোন ধমনিটা বন্ধ হয়ে আসছে নির্ণয় করে সেটা পরিষ্কার করে দেবার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

হার্টের রোগনির্ণয়ে একসময় স্টেথেসকোপ দিয়ে হৃৎকম্পন মেপে কিছু বুঝতে পারা ছাড়া ডাক্তারের বিশেষ কিছু করার থাকত না। আজকাল কিন্তু আরো বহু উপায় রয়েছে এর। রক্তনালি বেয়ে সোজা হার্টে ক্যাথিটার নামে সুচ চালান করে দিয়ে সেখানকার নানা ত্রুটি বোঝার সুবিধা হয়েছে। ওখানে বিশেষ তরল ক্যাথিটারের সাহায্যে ঢুকিয়ে ও এক্সরে ছবি তুলে এটা বোঝা যায়। রক্তের সাথে তেজস্ক্রিয় কিছু যৌগ ইনজেকশন করে মিশিয়ে পরে তেজস্ক্রিয়তার উদ্ঘাটকের সাহায্যে হার্টের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। উদ্ঘাটকের সংকেতকে কম্পিউটারের সাহায্যে কর্মরত হার্টের নানা বর্ণের ছবিতে রূপান্তরিত করে অনেক কিছু স্পষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে। শব্দ-তরঙ্গকে হার্টের পেশি থেকে প্রতিফলিত করে তার প্রতিচ্ছবি থেকেও পর্দায় হার্টের চলচ্চিত্র দেখা যায়।

হার্টের অসুখের নিরাময়ে ওষুধেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ওষুধগুলো ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। মূত্রবর্ধক ওষুধ রক্তের অতিরিক্ত জলীয় অংশ সরিয়ে ফেলে তার চাপ কমায়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বাতজ্বরসহ আনুষঙ্গিক মারাত্মক অসুখগুলোর বিরুদ্ধে চমৎকার কাজ দিচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহুরকমের ওষুধ এখন চিকিৎসকের হাতে রয়েছে। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে হার্টকে পুনরায় দ্রুত চালু করার বিশেষ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

হার্টের অসুখে হস্তক্ষেপ করার শেষ অস্ত্র হল অস্ত্রোপচার— আজকাল তারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কৃত্রিম হার্ট-লাং মেশিন ব্যবহার করে সার্জনরা এখন হার্ট ও ফুসফুসকে শরীরের অন্য অংশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে নির্বিঘ্নে হাতে অস্ত্রোপচার করতে পারেন। এগুলো আগে অকল্পনীয় ছিল। এভাবে হার্টের কপাট ঠিক করে দেয়া যায়, ধমনির লিক সারানো যায়, এমনকি ত্রুটিপূর্ণ কপাট সরিয়ে সেখানে কৃত্রিম কপাটও বসানো যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া ধমনিকে এড়িয়ে গিয়ে রক্ত-সঞ্চালনের অন্য বিকল্প পথের ব্যবস্থা করে স্ট্রোক থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। হার্টের কম্পনের ছন্দ ব্যাহত হলে তার তালরক্ষাকারী কৃত্রিম যন্ত্রও বসানো যাচ্ছে। পেইস মেকার নামে এই যন্ত্রকে ব্যাটারি দ্বারা চালু রাখা হয়।

হার্টের সফল অস্ত্রোপচারের পর প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়া আজকাল সচরাচর ঘটনা। আমাদের এই কালে তার অধিক বৈকল্যের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণায় হার্ট যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে হার্টের অসুখের চিকিৎসায় যথেষ্ট আশারও সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি এ-অসুখের মহামারিকে পুরাপুরি অতিক্রম করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মিত অভ্যাসগুলো গড়ে তুলতে হবে। অসুখের আগাম সংকেতগুলোকেও চিনে নিয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসার যত উন্নতিই হোক, এই সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

ISBN 984 410 279 0